সুধাংশু পাত্র

জীব জগতের বিস্ময়

বাদুড়
ডলফিন
সিলাকান্থ

জীব জগতের বিস্ময়

জীব জগতের বিস্ময়

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

সূচীপত্র

বর্তমানের বিস্ময় জীবন্ত জীবাশ্ম ৯
সিলাকান্থ মাছ ১২
লাঙফিস বা ফুসফুস মাছ ১৭
টুয়াটারা ২১
ডাইনোসোরদের বংশধর—হংসচঞ্চু ২৪
অঙ্কগর্ভ প্রাণী—কাঙ্গারু, ওপোসাম, কোয়েলা ৩০
কোমোডো ড্রাগন ৩২
সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী (তিমি, ডলফিন, মৎস্যকন্যা বা ডুগং, সীল ও ওয়ালরাস) ৩৬
কয়েকটি আজব প্রাণী ৪৯
(উট, লামা, কাঙ্গারু র‍্যাট, জিরাফ, শ্লথ, আর্থপিগ, রেকুন, বাদুড়, মাকড়সা, প্যাঙ্গোলিন, আর্মাডিলো ও গণ্ডার, বনমানুষ)
যাযাবর পাখী ৬৬
পশুপাখীর সহ-অবস্থান ও বন্ধুত্ব ৭৩
জীবজগতের বিস্ময় পোকামাকড় ৮২
জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গদের ঘর বাড়ী ৮৫
নিশাচর প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি ৯০
অন্ধকারের বিস্ময় জোনাকি ৯২
পাখীর পালক ৯৫
জীবজন্তুর স্বাভাবিক শক্তি ও মানুষের তৈরি যন্ত্র ৯৮

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই ঃ

পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
মনের মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

জীব জগতের বিস্ময়

প্লাটিপাস

প্যাঙ্গোলিন

লাঙ্‌ ফিস

কোমোডো ড্রাগন

প্লাটিপাস

কাঙারু
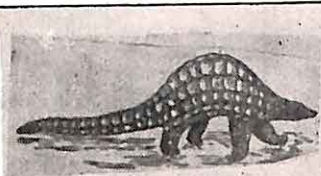
ম্যানাটি
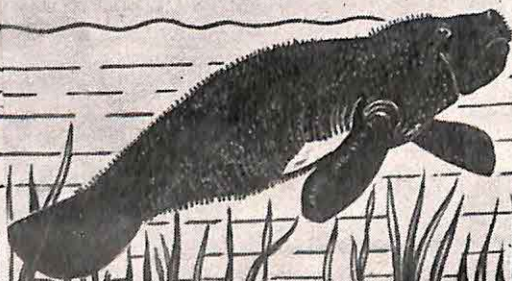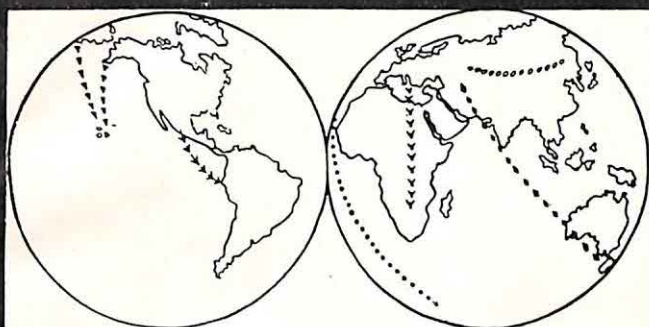
কয়েকটি যাযাবর পাখি ও তাদের পথ
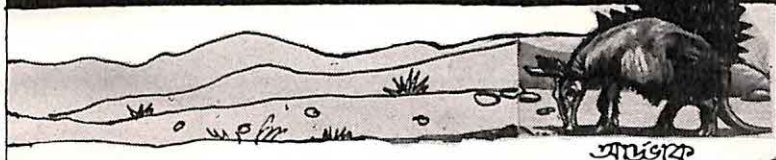
বর্তমানের বিস্ময় জীবন্ত জীবাশ্ম

জীবন্ত জীবাশ্ম কি এবং তার প্রতি মানুষের কেন এত আগ্রহ?

প্রথমে কেবলমাত্র জীবাশ্মের কথায় আসা যাক। যেহেতু অশ্ম হচ্ছে পাথর। তাই জীবাশ্ম বলতে সংক্ষেপে জীবের (উদ্ভিদেরও) পাথরে রূপান্তরিত দেহ বা দেহাংশকে বোঝায়।

এখন প্রশ্ন আসবে, জীবের দেহটা কেমন করে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায় তথা জীবাশ্মে পরিণত হয়?

তার উত্তরে বলা হয়ে থাকে, হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, এমন কি কোটি-কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যেসব জীবের আগমন হয়েছিল তাদের কারও কারও আস্ত দেহখানা অথবা তাদের কঙ্কাল নানাকারণে মাটির তলায় চাপা পড়তে বাধ্য হয়েছিল। কিংবা সঞ্চিত হয়েছিল হ্রদ কিংবা নদীর তলদেশে। কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে জলপ্রবাহ ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বাহিত পলি স্তরে স্তরে জমে উঠেছে তাদের উপর। ফলে আভ্যন্তরীণ চাপ এবং তাপের প্রভাবে সেগুলি নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে পরিণত হয়েছে শক্ত শিলা বা পাথরে। তাছাড়া সেই সুদূর অতীতে আবির্ভূত প্রাণীরা নদীর তীরে জল খেতে এসে তথাকার নরম মৃত্তিকায় এঁকে দিয়েছিল পায়ের ছাপ। উপরে জমে উঠেছে পলির স্তর অথচ ছাপযুক্ত নরম মাটি রূপান্তরিত হয়ে গেছে শক্ত শিলায়। এমনও হয়েছে, নানা প্রাকৃতিক কারণে প্রাণীর দেহখানা নষ্ট হয়ে গেলেও চারপাশের মাটি কালক্রমে শক্ত শিলায় পরিণত হওয়ায় আস্ত প্রাণীর চিহ্নটি মুদ্রিত হয়ে থেকে গেছে। কোথাও কোথাও প্রাণীর অন্ত্রের বিষ্ঠাকুণ্ডলী, কঙ্কাল ইত্যাদিও বিশেষ পরিবেশে শিলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এদের সবকিছুকেই জীববিজ্ঞানীরা জীবাশ্মরূপে গণ্য করে থাকেন।

কিন্তু জীবন্ত জীবাশ্ম? পাথরে রূপান্তরিত অতীতের সেই সব জীবদের দেহে এখনও কি প্রাণ আছে?

তাও কি কখনও হয়? কোটি কোটি বছর আগে যারা মাটি চাপা পড়েছিল তাদের দেহে কি প্রাণ থাকতে পারে?

তাহলে ?

এই পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা। সেই আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত এর উপর দিয়ে বহে গেছে কত-ঝড়-ঝাপ্টা, কত বিপর্যয়! কখনও প্রবাহিত হয়েছে একটানা শৈত্যপ্রবাহ, আবার কখনও শুষ্কপ্রবাহ। কখনও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ছারখার হয়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা আবার কখনও ভূমিকম্পে এক বিরাট অঞ্চল তলিয়ে গেছে মাটির তলায়। কখনও সারা পৃথিবীটা আচ্ছাদিত হয়েছে বরফে বরফে, কখনও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে উপকূলভাগ, আবার কখনও মুল স্থলভাগ থেকে কিছু কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মগোপন করেছে মহাসমুদ্রের বিশাল গর্ভে। এসবের ধকল সইতে হয়েছে প্রাণীদের। সে দুঃখের যেন শেষ নেই।

অতি ভয়ঙ্কর সব দুর্যোগ আসার ফলে পৃথিবীর পরিবেশটারও নানা পরিবর্তন ঘটেছে। যেহেতু জীবমাত্রই পরিবেশের ক্রীড়নক, তাই পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের অধিকাংশকে হারিয়ে যেতে হয়েছে। আর যারা কোন-প্রকারে টিকে গেছে তাদের উত্তরপুরুষরা পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অর্জন করেছে নানা বৈশিষ্ট্য। ফলে নতুন পরিবেশে যেন নতুন জীবে পরিণত হয়েছে।

যারা হারিয়ে গেছে তাদের পরিচয় পাই আমরা জীবাশ্মের মাধ্যমে। আর যাদের বংশধারা এখনও টিকে আছে তাদের আদিম রূপটিরও পরিচয় প্রদান করছে ঐ জীবাশ্ম। তবে এমন কিছু কিছু জীবের হদিশ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে, যাদের জীবাশ্ম লাভ করে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন পরিবর্তিত পরিবেশে অনেক আগেই ওরা হারিয়ে গেছে। এদের বাস্তব অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব মনে হয়েছিল তাঁদের কাছে। কিন্তু প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল! কোটি কোটি বছর ধরে অবিরত কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থেকেও টিকিয়ে রেখেছে তারা তাদের আদি ও অকৃত্রিম রূপ। হারিয়ে যায়নি তাদের বংশধারা, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে লাভ করেনি কোন নতুন বৈশিষ্ট্য, কোটি কোটি বছর আগে আবির্ভূত জীবের জীবাশ্মের মতই একেবারে নিখুঁত ও নির্ভেজাল।

এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি প্রজাতির অতি অল্পসংখ্যক এই ধরনের জীবকে বিজ্ঞানীরা লাভ করেছেন। পৃথিবীর সর্বত্রও ওদের দেখা যায় না। আর আবিষ্কারও করা হয়েছে এই বিংশ শতাব্দীতে।

অতীতে পৃথিবীর সেইসব বাসিন্দা—যাদের জীবাশ্মকে লাভ করে ধরে নেওয়া হয়েছিল, ওরা হারিয়ে গেছে কোটি কোটি বছর আগে। এখন দেখা যাচ্ছে, মুষ্টিমেয় হলেও কয়েকটি প্রজাতি আজও টিকে আছে। তাই বিজ্ঞানীরা ওদের

নামকরণ করেছেন জীবন্ত জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিল।

বর্তমানের দৃষ্টিতে লিভিং ফসিলরা এক মূর্তিমান বিস্ময়, যেন কল্পলোকের বাসিন্দা কিংবা রূপকথার সেই অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তুজানোয়ার। কৃপাময়ী ধরণীর অকৃপণ কৃপায় কৃথার্থ আজকের জীব বিজ্ঞান। কেন, সেই কথায়ই আসছি এখন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। সে তার অতীত পরিচয়টাকে উদ্ধার করতে চায়। জানতে চায়, সে কেমন করে এই পৃথিবীতে এসেছিল? কেমন ছিল তার আদি রূপ? আর কেমন করেই বা জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে তার আপন স্বাতন্ত্র্যকে জাহির করলো?

পৃথিবীর বুকে প্রাপ্ত জীবাশ্মকে নিয়ে গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, মানুষ জাতটা হল জীবজগতের বিবর্তনের চরম বিকাশ। প্রায় চারশ' কোটি বছর আগে সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবী তার স্বীয় অবয়ব লাভ করেছিল। অতি উত্তপ্ত পরিবেশে সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনী রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতির প্রভাবে দু'শ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জৈব যৌগগুলি সংশ্লেষিত হয়েছিল। তারপর পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি নামলে সেগুলি বৃষ্টিধারার সঙ্গে নেমে এসেছিল এবং জলমগ্ন পৃথিবীর বুকে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল এককোষী প্রাণী। পরে এককোষী প্রাণী থেকে বহু কোষযুক্ত নিরস্থিক প্রাণী, নিরস্থিক থেকে মেরুদণ্ডী, এইভাবে বিবর্তনের সর্বশেষ ধাপে এসেছে মানুষ।

বিজ্ঞানীদের এটি নিছক কোন কল্পনা নয়। ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলিকে লক্ষ্য করেই অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আরও ধরে নিয়েছিলেন, সমস্ত মেরুদণ্ডীদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে মাছ। মাছদের আবার আবির্ভাব হয়েছিল খোলসযুক্ত প্রাণী থেকে। পরবর্তীকালে মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে স্থলচর প্রাণীদের আবির্ভাব। অপরদিকে স্তন্যপায়ীদের আগমন হয়েছে ডিম্বপ্রসবীদের কাছ থেকে। কিন্তু সরাসরি কেউ আসতে পারেনি। জলচর থেকে উভচর হতে কিংবা ডিম্বপ্রসবী থেকে স্তন্যপায়ীদের আসতে কোটি কোটি বছর লেগেছিল। অর্থাৎ এক-একটি ধাপের চরম বিকাশ লক্ষ লক্ষ পুরুষের অধ্যবসায়ের ফল। অবশ্য এর জন্য দায়ী পৃথিবীর পরিবেশের বার বার পরিবর্তনের ফল।

পরিবেশের মোকাবিলা করে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বিবর্তনের কত স্তর যে অতিক্রম করতে হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। সব স্তরের জীবাশ্মও লাভ করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। অপরদিকে জীবন্ত অবস্থায় না পাওয়া যাওয়ায় জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারাগুলি সম্বন্ধে কিছুটা গোলমাল ছিল

এবং নানা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সম্প্রতি আবিষ্কৃত জীবন্ত জীবাশ্ম-গুলিকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, তাঁদের পূর্ব ধারণাটি সম্পূর্ণরূপেই অভ্রান্ত। মাছ থেকে উভচর, ডিম্বপ্রসবী থেকে স্তন্যপায়ী ইত্যাদি ধাপগুলির আজও সাক্ষ্য বহন করে চলেছে সিলাকান্থ মাছ, ফুসফুস মাছ, হংসচঞ্চু বা প্লাটিপাস প্রভৃতি। ওদের জীবাশ্ম অনেক আগেই বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছিল। আজ অতীতের নীরব সাক্ষী সেইসব প্রাণীদের হাতের কাছে লাভ করে আরও ভালভাবে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছেন। সেই সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে জীবের বিবর্তনের ইতিহাসের অন্ধকারময় কয়েকটি পৃষ্ঠা।

* সিলাকান্থ মাছ *

[শ্রেণী—ক্রসোপটেরিজায়ন, বর্গ—রিপিডিসটিয়ান, উপবর্গ—সিলাকান্থ,
বৈজ্ঞানিক নাম—ল্যাটমেরিয়া কলামনি।]

মাছ বটে সিলাকান্থ, কিন্তু বড় বিচিত্র ধরণের মাছ। এমনকি মাছের রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের মাছ বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। জল থেকে তুললে যেন তেড়ে এসে কামড় দিতে চায়। চেহারাটাও কিম্ভূতকিমাকার। ডিম না পেড়ে বাচ্চা প্রসব করে। পাখনা আছে, তবে মাছের পাখনার মত নয়। তবু ওরা মাছ।

তাহলে কি ধরনের মাছ এই সিলাকান্থরা?

মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছদের বিজ্ঞানীরা চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। (১) চোয়ালবিহীন (২) প্লাকোডার্ম (৩) তরুণাস্থি বিশিষ্ট ও (৪) অস্থিযুক্ত। সিলাকান্থ ঐ চারশ্রেণীর কোনটিতে পড়ে না। কারণ, অস্থিযুক্ত হলেও ওদের মেরুদণ্ডটা তরুণাস্থি বিশিষ্ট।

অপরদিকে পাখনার আকার দেখেও মাছদের দু-শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) সাধারণ পাখনাযুক্ত ও (২) মাংসল পাখনাযুক্ত। সিলাকান্থের ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাছ।

পাখনা সম্বন্ধে দু-এক কথা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আমরা সচারাচর যেসব মাছকে দেখি তাদের সবাই প্রায় সাধারণ পাখনাযুক্ত। এদের পাখনায় থাকে "ফিনরে"। অর্থাৎ পাখনা তৈরি হয়েছে কতকগুলো কাঁটা দিয়ে, এবং সে কাঁটা উৎপন্ন হয়েছে দেহস্তরের ভেতর থেকে। কিন্তু মাংসল পাখনা-যুক্তদের এমনই বৈশিষ্ট যে, জীব-জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত এক একটি মাংসল অংশ।

শরীর থেকে ঝুলে পড়েছে। আর ঐ মাংসল অংশটির তলদেশে কাঁটাযুক্ত পাখনা অনেকটা হাতের আঙ্গুলের মত কিংবা ঝালরের মত ঘিরে আছে। ঝালরযুক্ত এই পাখনার বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন "লব্‌ড ফিন" (Lobbed fin)।

সিলাকান্থদের লব্‌ড ফিনের সংখ্যা আট। এক জোড়া বক্ষ পাখনা এক জোড়া শ্রোণী পাখনা, এক জোড়া পৃষ্ঠ পাখনা, একটি পায়ু পাখনা এবং একটি পুচ্ছ পাখনা। পিঠের পাখনা সাধারণ মাছের পৃষ্ঠ পাখনার মত মনে হয়। তবে সেগুলিও লব্‌ড ফিন।

সিলাকান্থদের এক একটিকে মৎসরাজও বলা যেতে পারে। পূর্ণবয়স্ক সিলাকান্থরা ওজনে ৮০ কিলোগ্রামের মত এবং লম্বায় পাঁচ থেকে সাত ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে একটু গভীর জলেই ওরা বাস করে। প্রায় ৩০০ ফুট গভীরে শিলাস্তরের খাঁজের পাশে অথবা গহ্বরে চুপচাপ পড়ে থাকে। গায়ের রঙটা চকচকে ইস্পাতের মত একটু নীলাভ। মরে গেলেও কিন্তু গায়ের রঙটা বাদামী হয়ে পড়ে। চোখ দুটো সবুজাভ হলদে এবং বেশ উজ্জ্বল ও চকচকে। চোখে ফসফরাস থেকে নির্গত আলোর সাহায্যে সিলাকান্থরা শিকার ধরে।

সিলাকান্থদের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, ওরা মাছ হয়েও ডিম পাড়েনা। নিজের আকৃতিবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে অথচ সে সন্তান মায়ের দুধ পান করেনা। গায়ে অবশ্য বেশ বড় বড় আঁশ থাকে।

উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলির জন্য বিশেষজ্ঞরা তাদের আদি উভচরদের পূর্বপুরুষ-রূপে চিহ্নিত করেছেন। এদের আগমন হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে প্যালিওজোয়িক মহাযুগের মধ্যভাগে তথা সিলুরিয়ান ও ডিভোনিয়ান যুগের সন্ধিক্ষণে। বিজ্ঞানীদের মতে উক্ত সময়ের মাত্র কয়েককোটি বছর পূর্বে জলমগ্ন পৃথিবীর বুকে প্রথম ডাঙা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এবং ডাঙার বুকে বনভূমিরও সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সেই বনভূমিতে একমাত্র কীটপতঙ্গ ছাড়া আর কারও আবির্ভাব হয়নি। অপরদিকে মাছদের বংশ বিস্তারের ফলে মহাসমুদ্রে তখন চলেছে মাৎস্যন্যায়। সমুদ্রে স্থানাভাব হেতু অথবা সমুদ্রের কোন কোন স্থানকে ঘিরে পাঁচিলের মত ডাঙা আত্মপ্রকাশ করায় জলচর মাছদের কোন কোন প্রজাতি স্থলের দিকে যাত্রার আয়োজন করে। কিন্তু ফিনরে সমন্বিত মাছের পাখনা ডাঙায় ওঠা ও চলাফেরার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। তাই ডাঙায় উঠে আসার প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের ফলে হাজার হাজার পুরুষ পরে তাদের পাখনাগুলো লব্‌ড ফিনে পরিণত হয়েছিল।

তবে তাদের উত্তরপুরুষরা সহসা ডাঙায় উঠে আসতে পারেনি। যেহেতু

জলচরদের দৈহিক ও আভ্যন্তরীণ গঠন জলেই বাস করার উপযোগী এবং স্থলের বাসিন্দাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই জল থেকে ডাঙায় উঠতে তাদের বংশানুক্রমে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রস্তুতি চালাতে হয়েছিল। অবশেষে প্রায় পাঁচ কোটি বছরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ডিভোনিয়ান যুগে তথা আজ থেকে প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে কারও কারও উত্তরপুরুষ পুরোপুরি উভচর হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

জীবন্ত সিলাকান্থ এবং ওদের জীবাশ্মকে নিয়ে বিস্তর গবেষণার দ্বারা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, সিলাকান্থরা এসেছিল জীবের উভচর হওয়ার ঠিক প্রাথমিক পর্যায়ে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এটি এমন এক পর্যায়—যে পর্যায়ে জলে বাস করার কোন বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়নি অথচ ডাঙায় চলাফেরার জন্য দেহে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার তার হয়েছে সবে শুভ সূচনা।

বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে আরও জানা গেছে, চল্লিশ কোটি বছর আগে বিবর্তনের ধারায় উভচরদের আদি পুরুষ ক্রসোপটেরিজিয়ান নামক এক শ্রেণীর মেরুদণ্ডী জীবের জলে আবির্ভাব হয়েছিল। কালক্রমে ওদের থেকে দুটি দলের বা বর্গের সৃষ্টি হয়। একটির নাম রিপিডিসটিয়ান এবং অপরটির নাম ডিপনোয়িয়ান। কালের ধারায় রিপিডিসটিয়ানরাও নিজেদের ঠিক রাখতে পারেনি। বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দুটি উপদলে। একটি অসটিওলিপিডোটিয়ান ও অপরটি সিলাকান্থিনিয়ান।

পরবর্তীকালে রিপিডিসটিয়ানদের প্রথম শাখা আসটিওলিপিডোটিয়ানরাই উভচর হওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছিল। কিন্তু তাদের কোন অস্তিত্ব এখন নেই বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। বহু কোটি বছর আগে তারা হারিয়ে গেছে। কেবল আজকের দিনে পাওয়া কতকগুলি জীবাশ্মই বহন করে চলেছে সেকালে তাদের উপস্থিতির সাক্ষ্য।

অপর দল সিলাকান্থরা কিন্তু হারিয়ে যায়নি। হয়ত উভচর হওয়ার অতি সামান্য যোগ্যতা অর্জন করলেও ওদের উত্তরপুরুষরা ডাঙার দিকে ধাবিত হওয়ার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। আগের মত সেই বিচিত্র শরীরটাকে নিয়ে জলেই থেকে গেছে এবং এখনও পর্যন্ত টিকে আছে তাদের বংশধারা। বিজ্ঞানীদের চোখে তাই এরা এক একটি মূর্তিমান বিস্ময়।

আরও উল্লেখ করতে হয় যে, যে সময় সিলাকান্থদের আবির্ভাব হয়েছিল সেকালে সমুদ্রের জল হয়ত আদৌ লবণাক্ত ছিলনা। সমুদ্রজলে নুনের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে আজ এই অবস্থায় এসেছে। তাতেও কিন্তু কোন অসুবিধা হয়নি সিলাকান্থদের। ধীরে ধীরে গা-সওয়া হয়ে গেছে এবং থেকে

গেছে সেই একইভাবে। এত দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের এভাবে সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত রাখা অপর কোন জীবের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরা যেন একটি ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, সমুদ্রে বিবর্তনের চাহিদা খুব কম এবং সেখানে ওদের কঠোরভাবে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়নি তাই টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে সিলাকান্থদের বংশধারা।

সিলাকান্থদের উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে মাত্র ১৯৩৮ সালে। তার আগে প্রাপ্ত জীবাশ্ম থেকে বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন অতীতের অপরাপর বহু জীবের মত এরাও লুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। কিন্তু সেই বছর একটি বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দারুণভাবে সাড়া পড়ে যায়।

ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কলামনা নদীর মোহনায়। জেলেদের জালে অন্যান্য মাছের সঙ্গে উঠলো পাঁচ ফুট লম্বা এবং ১২৭ পাউণ্ড ওজনের একটি অদ্ভুতদর্শন মাছ। জেলেরা কোনদিন দেখেনি এমন ধরনের মাছ এবং শোনেনিও এ-ধরনের মাছের কথা। জেলেদের নেতা ছিলেন গুসেন নামে জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক। তিনি মাছটিকে দেখে এমন বিস্ময়বোধ করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে সনাক্ত করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন লণ্ডন মিউজিয়ামের কিউরেটর শ্রীমতি ল্যাটিমারের কাছে।

শ্রীমতি ল্যাটিমার কিন্তু মাছটিকে সনাক্ত করতে পারলেন না। তখন বাধ্য হয়ে খবর পাঠালেন বিখ্যাত মৎস্যবিশেষজ্ঞ ও রোড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জে. বি. এল. স্মিথের কাছে। সে সময়টা স্মিথ সাহেব আবার ছুটিতে থাকায় সময়মত খবর পেলেন না। ততদিনে মাছটাতে পচন শুরু হয়ে গেছে। উপায় না দেখে শ্রীমতি ল্যাটিমার তখন মাছটির ফটো এবং মাথার খুলি ও চামড়াকে সংরক্ষণ করলেন।

সিলাকান্থদের জীবাশ্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন স্মিথ। যখন ছবিটি তাঁর হাতে পড়ল তখন তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কেবলই তাঁর মনে হতে লাগল চল্লিশ কোটি বছর আগেকার হারিয়ে যাওয়া এই মাছ কোন্ যাদুমন্ত্র-বলে ফিরে এল মানুষের কাছে? সব কাজ ফেলে তিনি ছুটে গেলেন শ্রীমতি ল্যাটিমারের কাছে।

স্মিথ এসে কেবলমাত্র মাছটার মাথার খুলি ও চামড়াটাই দেখলেন। আস্ত মাছটা তাঁর আর দেখা হলনা। ভয়ানক দুঃখিত হলেন তিনি। তারপর মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে মাছটির ফটো বিতরণ করলেন জেলেদের মধ্যে।

সুদীর্ঘ চৌদ্দটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু কোন পাত্তা পাওয়া গেল না সিলাকান্থদের। শেষে ১৯৫২ সালে কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের আনজুয়ান দ্বীপের

সন্নিকটে এক জেলে লাভ করলো দ্বিতীয় সিলাকান্থ। পূর্বের থেকে এটি ছিল আরও বড়। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ জেলেটি মাছটার মাথা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে নষ্ট করে ফেলেছিল। তা সত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এটিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বিশেষ এক বিমানযোগে পাঠিয়ে দিলেন ডঃ স্মিথের কাছে।

মাথা থেৎলানো মাছটাকে দেখে এবারও হতোদ্যম হলেন স্মিথ। তবে গবেষণার দ্বারা সিলাকান্থদের আসল বসবাসের স্থানটাই নির্ণয় করে নিলেন। এবং জেলেদের ও বিজ্ঞানী মহলে জানিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। পুনরায় পুরস্কারও ঘোষণা করলেন আস্ত একটি সিলাকান্থের জন্য।

শুধু জেলেদের মধ্যে নয়, বিজ্ঞানী মহলেও এবার দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেল। স্মিথ যেহেতু ঘোষণা করেছিলেন, কোমোরো দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি অঞ্চলে এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলভাগ থেকে সুদূর মাদাগাস্কার পর্যন্ত এক বিরাট এলাকায় সিলাকান্থদের বাস। তাই জেলেদের সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও নেমে পড়লেন অক্ষত এক সিলাকান্থকে হস্তগত করার জন্য। বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী জে. এইচ. মিলটও ছিলেন একজন।

১৯৫৩ সালে ধরা পড়ল তৃতীয় সিলাকান্থ। এবার যেহেতু যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাই সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল সিলাকান্থটিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকে প্রেরণ করা হল মাদাগাস্কার গবেষণাগারে। পরের বছর আবার ফরাসী সরকারের তত্বাবধানে ধরা পড়ল আরও তিন তিনটি মাছ। স্বয়ং মিলটই এগিয়ে এলেন মাছগুলিকে নিয়ে গবেষণার জন্য। অবশেষে তিনিই প্রাণীদের বিবর্তনের ইতিহাসে সিলাকান্থদের গুরুত্বের কথা প্রকাশ করলেন। আর তখনই ওদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে নামকরন করা হল ল্যাটমেরিয়া কলামনি।

সিলাকান্থদের দৈহিক ও আভ্যন্তরীণ গঠন উভয়েরই বিশ্লেষণ করেছেন মিলট। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই গবেষণাবলী থেকে সিলাকান্থ সম্বন্ধে সমুহ তথ্য আহরণ করেছে জীববিজ্ঞান। আর সেই থেকে স্মিথ ও মিলট উভয়েই অমর হয়ে আছেন।

সিলাকান্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একদিন যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে ওদের আর হত্যারও প্রয়োজন হচ্ছে না। জানা গেছে, ওদের বসতিতে ওদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাই এদের সহসা হারিয়ে যাওয়ারও ভয় নেই। বিজ্ঞানীদের মনে এখন একটিমাত্র বিস্ময়, ওরা এতকাল ধরে কেমন করে ওদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে? নাকি সমুদ্রের কোথাও কোথাও আজও টিকে আছে আদিম পৃথিবীর সেই আদিম পরিবেশ?

যাই হোক, প্রাণীর বিবর্তনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের জীবন্ত প্রতীক এই সিলাকান্থরা। এদের লাভ করার পর থেকে বিজ্ঞানীদের আরও ধারণা, অতীতের হারিয়ে যাওয়া জলচর প্রাণীদের কারও কারও বংশধারা হয়ত আজও টিকে আছে। ভবিষ্যতে মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে আরও দু-একটি উদ্ধার হলেও হতে পারে।

* লাঙফিস বা ফুসফুস মাছ *

[শ্রেণী—ক্রসোপটেরিজিয়া, বর্গ—ডিপনোয়ি।]

মাছ মাত্রেই জলের বাসিন্দা। জল ছাড়া ওরা বেশীক্ষণ বাঁচতে পারেনা। অপরদিকে মাছরা জীব এবং জীবের ধর্মই হচ্ছে বেঁচে থাকতে হলে শ্বাসকার্য চালাতে হয়। কিন্তু মাছ ডাঙার জীবের মত সরাসরি বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারেনা। মুখের একটু উপরে দুপাশে দুটি নাশারন্ধ্র অবশ্যই আছে। তবে মুখের সঙ্গে নাসারন্ধ্রের কোন যোগ না থাকায় শ্বাসকার্য্যের কোন সহায়তা করেনা। কেবল ঘ্রাণ নিতেই সাহায্য করে।

মাছরা শ্বাসকার্য চালায় কানকোর তলায় লাল চিরুনির মত ফুলকোর সাহায্যে। আবার ঐ ফুলকোর গঠন এমনই যে, কেবলমাত্র জলেই কাজ করতে সক্ষম। অর্থাৎ ঐ ফুলকো জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনকেই গ্রহণ করার সামর্থ্য রাখে। ডাঙায় ঐ যন্ত্রটি একেবারেই অচল। ঐ কারণে মাছকে জল থেকে তুললেই মারা যায়। কেবল কই, মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় ডাঙায় কিছুক্ষণ টিকে থাকতে পারে মাত্র।

কিন্তু এমন এক ধরনের মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা দিনের পর দিন ডাঙায় পড়ে থাকলেও দিব্যি বহাল তবিয়তে থাকতে পারে। নাম তাদের লাঙফিস বা ফুসফুস মাছ।

পৃথিবীর তিনটি বিশেষ জায়গায় তিন রকমের লাঙকিসকে দেখা যায়। সে তিনটি জায়গা হল কুইন্সল্যাণ্ড, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। কুইন্সল্যাণ্ডের প্রজাতিটির নাম নিওসেরাটোডাস (Neoceratodus), আফ্রিকার প্রজাতিটির নাম প্রটোপ্‌টেরাস (Protopterus) এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতিটির নাম লেপিডো সাইরেন (Lepidosiren)। অন্যত্র আর দেখা যায় না এদের।

যে কোন প্রজাতির লাঙফিসদের মুখটা ছুঁচলো, শরীরটা লম্বাটে ধরনের এবং লেজের দিকটা ক্রমশঃ সরু। কেবল নিওসেরাটোডাসদের পুচ্ছ অনেকটা

সিলাকান্থদের মতই চওড়া। একমাত্র ঐ প্রজাতিটি ছাড়া আর কারও গায়ে আঁশ থাকেনা। অন্যান্য মাছের মত দেহটাও কারও পিচ্ছিল নয়। বেশ খসখসে। পাখনা এবং শ্বাসযন্ত্র, দুটি ক্ষেত্রেই ওদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমে পাখনার কথায় আসা যাক। লাঙফিসদের পাখনার সংখ্যা পাঁচ। পৃষ্ঠ-পাখনা নেই। মাথার দুপাশে কানকোর তলায় থাকে একজোড়া, অপর আর একজোড়া পেটের তলদেশে এবং লেজটাকে ঘিরে থাকে একটি ঝালর পাখনা। এগুলির কোনটিই সাধারণ মাছের পাখনার মত নয়। সিলাকান্থদের মত মাংসল প্রত্যঙ্গের সঙ্গে পাখনাগুলো যুক্ত। অর্থাৎ এদের দেহ থেকে সরাসরি ফিনরে উৎপন্ন হয়ে পাখনা গঠন করেনি। প্রত্যঙ্গের তলদেশে ঝালর পাখনা বা লব্ড ফিন, তথা পেশীবহুল প্রত্যঙ্গ।

পাখনার গড়ন সিলাকান্থদের মত হলেও ভারি অদ্ভুত ক্ষমতা ধারণ করতে পারে লাঙফিসদের পাখনাগুলো। ছোট ছোট শিশু যেমন মাটিতে হাত-পা ঠেকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে, এরাও ঠিক তেমনই জলের তলায় মাটিতে প্রত্যঙ্গগুলিকে ঠেকিয়ে অতি ধীর ও মন্থর গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলে শিকারের সন্ধানে। আবার ঐ পাখনা ও লেজের সাহায্যে জল কেটে অক্লেশে সাঁতারও দিতে পারে। এও সত্য যে, একমাত্র ঐ শিকার ধরার সময়ই আগাছার ভেতরে কালো শরীরটাকে বেমালুমভাবে মিশিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিতে থাকে। বেড়ালরা যেমন পাখী শিকার করার সময় মুখ ও পেট মাটিতে ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটে, এরাও অনেকটা তেমনই শিকারের অনুসন্ধান করে।

ওদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, ডাঙায় দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ক্ষমতা। মাসের পর মাসও যদি এরা ডাঙায় পড়ে থাকে তাহলেও এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেনা। অথচ জলহীন জায়গায় মাছকে যেন আমরা কল্পনার মধ্যেও স্থান দিতে পারিনা।

লাঙফিসদের ঐ বৈশিষ্ট্যটির জন্য দায়ী তাদের পেটের ভেতরের পটকা বা বায়ুথলি। যদিও পটকা অধিকাংশ মাছেরই থাকে এবং সে পটকা থাকে সবসময় বায়ুপূর্ণ। সাধারণ মাছের ক্ষেত্রে ঐ পটকা মাছকে ভেসে থাকতেই সাহায্য করে, শ্বাসকার্যে সহায়তা আদৌ করেনা। কিন্তু লাঙফিসদের পটকা বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ুকে সরাসরি টেনে এনে জমা করতে পারে এবং সেই বায়ুর দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। অনেকটা স্থলচর প্রাণীদের ফুসফুসের মতই কাজ করে থাকে। আর ঐ কারণেই মাছদের মধ্যে ওরা স্বতন্ত্র এবং নামটাও লাঙফিস বা ফুসফুস মাছ।

আরও মজার কথা, বায়ুকে সরাসরি গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালানোর ক্ষমতা সত্ত্বেও কানকো এদের আছে। যতক্ষণ ওরা জলে থাকে ততক্ষণ ঐ কানকোর

ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এককথায় জলে ও ডাঙায় কোথাও শ্বাসকার্য চালানোর জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়না। এমনকি অনেক উভচরের প্রায় সমকক্ষ এরা। কোন কোন উভচর আবার দীর্ঘসময় জলে ডুবে থাকতে পারেনা। অথচ এরা জল ও ডাঙা যে কোন পরিবেশেই মাসের মাস পর কাটিয়ে দিতে পারে।

তৃতীয় আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় লাঙফিসদের মধ্যে। ওরা অত্যন্ত রাক্ষুসে হওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙদের মত শীতঘুমে অভ্যস্ত। সাধারণতঃ এরা অগভীর অথচ আগাছাপূর্ণ জলা জায়গায় বাস করে। সমুদ্রেরও বাসিন্দা নয় এরা। বর্ষার শেষে জলাশয়ের জল যখন শুকে যায় তখন এরা মাটিতে কিছুটা গর্ত করে ঢুকে পড়ে। সেই সময় ওদের দেহ থেকে এক ধরনের রস নির্গত হয় এবং ঐ রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে গর্তের চারপাশটা বেশ মসৃন ও পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। তখন গর্তের ভেতরে মাথা ও লেজটা একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে সুখে নিদ্রা যায়। গর্ত অবশ্য দু-তিন ফুটের বেশী গভীর করেনা। আর জলও থাকে-না সে গর্তে। তবে পিচ্ছিল হওয়ার জন্য বেশ স্যাঁতসেঁতে থাকে। আর ঐ কারণে শীতে ও গরমে কোন সময়েই অসুবিধা হয়না। যেন এক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ তারা তৈরি করে নেয়। অপরদিকে ঐ ঘুমিয়ে পড়ার সময়কালটাই তারা শ্বাসকার্য চালায় ফুসফুসের সাহায্যে।

গর্তবাসকালে ওরা কিন্তু আদৌ কোন কিছু আহার করেনা। কয়েকমাস ধরে পর্যাপ্ত আহারের ফলে গায়ে প্রচুর চর্বি জমে উঠে। গর্তবাসকালে ঐ চর্বিই তাদের জোগায় জীবনরক্ষার উপাদান। পরে যখন বৃষ্টি নামে, তখন জল ঐ গর্তে প্রবেশ করলেই ঘুম ভাঙ্গে তাদের। ঠিক তক্ষুনি গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসে জল থৈ থৈ পরিবেশে আহার খুঁজতে আরম্ভ করে। কয়েকটা দিন আহারের পর হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে, ডিম পাড়ে এবং আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। এইভাবে কয়েকটা মাস দিব্যি ঘুরে বেড়ানোর পর পুনরায় বিস্তর চর্বি জমিয়ে ফেলে দেহে। এদিকে জলও শুকতে আরম্ভ করে। ঠিক সময়ে গর্ত খুঁড়ে আবার বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের দেশের চ্যাংমাছদের কথাও একটু বলতে হয়। ওদের অনেকেই শীত ও গ্রীষ্মকালটা গর্তে কাটায়। তবে ওরা নিজেরা কেউ গর্ত খুঁড়তে পারেনা। এক জাতীয় কাঁকড়া মাঠে জল শুকতে আরম্ভ করলে কার্তিক-অগ্রহায়ণের দিকে গর্ত খুঁড়ে প্রায় দশ-বার ফুট পর্যন্ত গভীরে চলে যায়। তখন গর্ত থাকে জলে ভর্তি। চ্যাংমাছরা খুঁজে পেতে একটি গর্ত বেছে নেয় এবং সেইখানটায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যেহেতু মাটির তলায় গর্ত এবং গভীর হওয়ার জন্য গর্তের

জল শুকিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনকে নিয়ে কানকোর সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাতেও অসুবিধা হয়না। তলায় থাকে কাঁকড়া আর উপরে ভেসে থাকে চ্যাংমাছ। আষাঢ়ে বৃষ্টি নামলে মাঠ-ঘাট যখন জলে জলময় হয়ে যায় তখনই উভয়ে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসে। খায়-দায়, ডিম পাড়ে—তারপর আবার সেই গর্তবাস। মাছ ও কাঁকড়ার এই যে সহ-অবস্থান সত্যই বড় বিস্ময়কর।

লাঙফিসদের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য অনুমান করা হয়, আদিতে যখন জলচর মাছ থেকে প্রথম উভচরের আবির্ভাব হয়েছিল তখনই এসেছিল এরা। অর্থাৎ মাছ ও উভচরদের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী জীব ঐ লাঙফিস। যদি সিলাকান্থদের উভচর হওয়ার প্রাথমিক পর্যায় ধরা যায় তাহলে লাঙফিসদের ধরতে হবে উভচর হওয়ার সর্বশেষ পর্যায়ের জীব।

বিশেষজ্ঞদের মতে আজ থেকে প্রায় তেত্রিশ কোটি বছর আগে ডিভোনিয়ান যুগের শুরুতে আমদানি হয়েছিল অনুরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আরও বহু জীবের। তারপর বিবর্তনের ধারায় কালক্রমে ওরা বহু প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের কেউ কেউ হারিয়ে গেছে, কেউ ডাঙায় উঠে এসেছে আর কেউ বা রক্ষণশীলদের মত ডাঙায় বাস করার ক্ষমতা অর্জন সত্ত্বেও ডাঙায় ওঠার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ঐ শেষোক্ত দলে পড়ে লাঙফিসরা।

যে সময় ওদের আবির্ভাব হয়েছিল, সে সময় সমুদ্রের জল অতি সামান্য পরিমাণে লবণাক্ত ছিল। পরের দিকে সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ বাড়তে থাকলে ওরা স্বাদু জলের সন্ধানে স্থলভাগের দিকে ছুটে আসে এবং সমুদ্র তীরবর্তী জলাভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। হয়ত আগে আরও কোন কোন জলাভূমিতে থাকতো তারা। বর্তমানে মাত্র তিনটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও এদের হদিস পাওয়া যায় না।

এককালে স্থানীয় অধিবাসীরা লাঙফিসদের খেতো। পরের দিকে যখন জানা গেল, ওরা অতীতের হারিয়ে যাওয়া জীবদের মধ্যে একটি—তখনই আইনের দ্বারা ওদের হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে! আইনটি বলবৎ আছে ১৮৭০ সাল থেকে।

লাঙফিসরা আকারে নিতান্ত ছোট নয়। লম্বায় চার থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিস্তর জীবাশ্মও পাওয়া গেছে ওদের। পণ্ডিতেরা ঐ কারণেই লাঙফিসদের জীবন্ত জীবাশ্মের পর্যায়ে ফেলেছেন। আর ওদের লাভ করে আমরাও জীবের ক্রম বিবর্তনের একটা বিশেষ স্তরের সন্ধান লাভ করেছি।

লাঙফিসরা সত্যই বড় অদ্ভুত ধরণের জীব। ত্রিশ কোটি বছরেরও অধিককাল তারা অব্যাহত রেখেছে তাদের জীবনধারা। অপরদিকে সেসময় পৃথিবীর বুকে আর যারা এসেছিল তাদের সবার জীবাশ্ম লাভ করা সম্ভব হয়নি এবং আস্ত জীবটিও হারিয়ে গেছে চিরতরে। জ্ঞানপিপাসু মানুষের কাছে এ দুঃখ চিরকাল থাকবে।

* টুয়াটারা *

[শ্রেণী—লেপিডোসাউরিয়া, বর্গ—রিনকোসেফালিয়া, বৈজ্ঞানিক নাম—স্ফেনোডন পাংকটেটাম]

বিজ্ঞানীরা জীবাশ্মকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, পৃথিবীর বুকে প্রায় আঠার কোটি বছরের মাছদের রাজত্বের পরে শুরু হয় সরীসৃপদের রাজত্ব। মাছরা ছিল জলের বাসিন্দা আর সরীসৃপরা পুরোপুরি না হলে স্থলচর ছিল বলা যায়। আর এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী জীব হচ্ছে উভচররা। যেহেতু উভচরদের আগমন হয়েছিল ডিভোনিয়ান যুগে, তাদের থেকে স্থলচরদের আসতে আরও কয়েক কোটি বছর লেগেছিল। পরে কারবনিফেরাস যুগের শেষের দিকে শুরু হয় পুরোপুরি সরীসৃপদের রাজত্ব। সে এক অদ্ভুত সময়! জলে, ডাঙায়, এমনকি একটু পরের দিকে আকাশেও ডানা মেলে ঘুরে বেড়াতো কেবল সরীসৃপ আর সরীসৃপ।

জল থেকে ডাঙায় উঠে আসতে এবং ডাঙার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীদেহে যেসব অদ্ভুত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি সিলাকান্থ মাছ ও লাঙফিসদের কাছ থেকে। ঐ লাঙফিসদের পরবর্তী ধাপই হচ্ছে আদি উভচর। তবে আদিম সেই উভচররা ডাঙায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে পারত না। অল্পক্ষণ পরে জলে অবশ্যই নামতে হত তাদের। অতঃপর লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে জল ও ডাঙায় স্বচ্ছন্দ্যে বিচরণ করার মত বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত উভচরদের আবির্ভাব হয় এবং এদেরই রাজত্বকাল সবার চেয়ে বেশী। কারণ, জুরাসিক যুগের সেই অতিকায় সরীসৃপরাও ছিল এক অর্থে উভচর।

যাই হোক, পৃথিবীর বুকে আদিম উভচরদের পরবর্তী ধাপই পুরোপুরি সরীসৃপে উন্নীত হয়েছিল। সে সরীসৃপরা ছিল অনেকটা আজকের দিনের গিরগিটিদের মত। তবে দৈর্ঘ্যে গিরগিটি অপেক্ষা অনেকটা বড় ছিল। অবশ্য

তখনও তারা অতিকায় কেউ হয়ে উঠতে পারেনি। দেহটা তেমন কাঁটা কাঁটা ছিলনা এবং লেজটাও ছিলনা বড় ও মোটা। ওদের জীবাশ্ম অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু আসল প্রাণীটি লুপ্ত হয়ে গেছে অনেক আগে। মাত্র একটি জীব আজও টিকে আছে—যাকে আদি উভচর ও সরীসৃপদের সংযোগরক্ষাকারী জীব হিসাবে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন। জীবটির নাম টুয়াটারা।

টুয়াটারাদের পরবর্তী ধাপেই এসেছিল প্রকৃত সরীসৃপ। তারই পরের ধাপে অতিকায় ও মহাবলশালী সরীসৃপদের আবির্ভাব হয়েছিল। পৃথিবীর সর্বকালের সর্ববৃহৎ জীব ছিল তারা। তবু বেশীকাল টিকতে পারেনি। মেসোজোয়িক মহাযুগের মধ্যভাগে আবির্ভাব আবার ঐ মহাযুগের শেষের দিকে মাত্র কয়েক-কোটি বছরের মধ্যেই বিলুপ্তি। কিন্তু টুয়াটারারা অতিকায় সরীসৃপের ঢের আগে থেকে আজও বজায় রেখেছে তাদের বংশধারা। অতএব আশ্চর্য নয় কি?

"টুয়াটারা" এই নামটি গ্রহণ করা হয়েছে গ্রীক শব্দ থেকে। গ্রীক টুয়া অর্থে কাঁটা এবং টারা অর্থে পৃষ্ঠ দেশ। বলাবাহুল্য ওদের পৃষ্ঠদেশে কাঁটা থাকার জন্য অনুরূপ নামকরণ করা হয়েছে। আসলে ওদের বৈজ্ঞানিক নাম স্ফেনোডন পাংকটেটাম।

জলের বিস্ময় যেমন সিলাকান্থ তেমনই স্থলের বিস্ময় এই টুয়াটারা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সমুদ্রের কোথাও কোথাও আদিম পরিবেশ টিকে আছে এবং বিবর্তনের চাহিদা নিতান্ত অল্প হওয়ায় সামুদ্রিক প্রাণীদের আদিম রূপ নিয়ে কারও কারও টিকে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু ডাঙায় পরিবেশের যেমন আমূল পরিবর্তন মাঝে মাঝে এসেছে তেমনই এখানকার জীবদের প্রতিনিয়ত কঠোর জীবনসংগ্রামেও অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। তাই সহজেই ডাঙার প্রাণীদের বংশধারার ক্ষেত্রে আসছে অদ্ভুত সব পরিবর্তন। অন্যদিকে ডাঙার প্রাণীদের লুপ্তও হতে হয়েছে বারে বারে। ঐ কারণে জীবন্ত জীবাশ্ম স্থলভাগে যেন আশাই করা যায়না।

অথচ ব্যতিক্রম ঐ টুয়াটারারা। এরা পুরোপুরি ডাঙার বাসিন্দা। অথচ সেই কারবনিফেরাস যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তারা যে কেমন করে তাদের বংশধারাকে টিকিয়ে রেখেছে তা রীতিমত এক বিস্ময়। অবশ্য পৃথিবীর দু-দশটা জায়গায় ওদের দেখা যায়না। একমাত্র নিউজিল্যাণ্ডেই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এদের।

গবেষকদের ধারণা, আজ থেকে প্রায় আঠার কোটি বছর আগে অর্থাৎ সরীসৃপদের জন্মলগ্নের কিছু পরে এক বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসেছিল। আদিতে পৃথিবীর স্থলভাগ একই জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ বিপর্যয়ের ফলে

স্থলভাগ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন বিপর্যয়ের ফলে মহাসমুদ্রে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এমন বিপর্যয় আরও এসেছে এবং আরও স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু নিউজিল্যাণ্ড মাঝ-সমুদ্রে আত্মগোপন করেছে সেই আমলে। পরবর্তীকালে সেখানে মূল ভূখণ্ডের মত জীবদের কঠোর জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়নি। খাদ্য পর্যাপ্ত থাকায় এবং কোন হিংস্র জন্তু না থাকায় একেবারে নিরুপদ্রবে ও পরম নিশ্চিন্তে কালযাপন করে আসছে। ফলে বিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় নি।

জন্তুটি আকারেও বেশ ছোট। অতি অল্পেই তাদের দিন চলে যায়। কিন্তু মূল বিবর্তন কেন্দ্রে যারা ছিল তাদের হরেক রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। খাদ্যের ঘাটতি ঘটেছে বারে বারে, শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে, পরিবেশের পরিবর্তনও সহ্য করতে হয়েছে কতবার। তাই বিবর্তন কেন্দ্রের সরীসৃপরা বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করতে করতে একদিন অতিকায় ডাইনো-সোররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং লুপ্ত হতেও বাধ্য হয়েছিল।

সরীসৃপদের পরেও কত ঘটনা ঘটে গেছে পৃথিবীতে। এসেছে স্তন্যপায়ী, শেষ হয়েছে অতিকায় ম্যামথ, খড়্গদন্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতির রাজত্বকাল, কালের ধারায় একদিন আবার এসেছে এদের চেয়েও উন্নত স্তন্যপায়ী, পরিশেষে বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করতে করতে একেবারে শেষে এসেছে মানুষ। মূল ভূখণ্ডে এত যে কাণ্ড ঘটে গেছে তা টুয়াটারারা টেরও পায়নি। তেমনই আঁকড়ে পড়েছিল তাদের গতানুগতিক জীবনধারাকে। কিন্তু টের পেল তখনই, যখন সমুদ্রে আত্মগোপনকারী নিউজিল্যাণ্ডকে বুদ্ধিমান মানুষের করে আত্মসমর্পণ করতে হল।

ছুটে এল দলে দলে সভ্য মানুষ। তাদের সঙ্গে এল শিকারী কুকুর। দীর্ঘ পঁচিশ কোটি বছর নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের পর টুয়াটারারা নিগৃহীত হল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ ও তার সঙ্গী কুকুরের দ্বারা। মাত্র তিন ফুটের মত লম্বা দুর্বল ও নিরীহ এই জীবটি কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারল না। মাত্র একশ মধ্যেই এগিয়ে গেল বিলুপ্তির দিকে।

আর ঠিক তখনই জন্তুটির প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন জীববিজ্ঞানীরা। এদের জীবাশ্মের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁদের। চোখের সামনে জীবিত এই প্রাণীগুলিকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সরকারকে অনুরোধ জানালেন বিরল এই প্রাণীটিকে রক্ষা করার জন্য।

একশ বছর ধরে নির্বিচারে হত্যার পর আইনের দ্বারা টুয়াটারাদের হত্যা নিষিদ্ধ হল। তখন টিকে ছিল অতি সামান্য সংখ্যক। কিন্তু আর ক্ষতি করতে

কেউ এগিয়ে না আসায় পুনরায় তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। আপাতত তাদের হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

টুয়াটারারা নিশাচর। দিনের বেলায় গুহার ভেতরে লুকিয়ে থাকে এবং রাত হলে শিকারের সন্ধানে বহির্গত হয়। শরীরটা গিরগিটির মত হলেও পৃষ্ঠদেশ তথা মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত ছুঁচলো কাঁটা দিয়ে ঘেরা। দেহের তুলনায় লেজটা বড় ও মোটা। কিন্তু লেজের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। এরা রিনকোসেফালিয়ানদের বংশধর।

ডাইনোসোরদের বংশধর

* হংসচঞ্চু *

পৃথিবীর সর্বকালের সুবৃহৎ ও মহাবলশালী, জলে-স্থলে-সর্বত্র অপরাজেয় কিংবদন্তীর মহানায়ক ডাইনোসোর আজকে আমাদের কাছে এক বিস্ময় ছাড়া কিছু নয়। ওদের কারও বংশধারা টিকে থাকতে পারেনি। হয়ত এত অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি বিশ্বপ্রকৃতি। বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। শুধু অতীতের স্মৃতি হিসাবে বক্ষে ধারণ করে আছে তাদের কিছু কিছু কঙ্কাল। আর টিকিয়ে রেখেছে তাদের বংশধারা থেকে উৎপন্ন শাখাগুলির মাত্র দু-একটি প্রজাতির অতি সামান্যসংখ্যক জীবকে।

অতীতের সেইসব ডাইনোসোর—যাদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে এখানে-ওখানে বহু জায়গায়, হস্তগত হয়েছে যাদের ডিম, পায়ের ছাপ ইত্যাদি, তাদের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলার প্রয়োজন আছে। ডাইনোসোর এই নামকরণের মূলে আছে গ্রীক ডিনাস এবং সোরস নামক দুটি শব্দ। ডিনাস শব্দের অর্থ বিশাল এবং সোরস অর্থে সরীসৃপ। যেহেতু জাতে ছিল ওরা সরীসৃপ এবং আকারে ছিল সুবৃহৎ; তাই অনুরূপ নামকরণ।

ডাইনোসোর বলতে বিশেষ এক ধরনের প্রাণী ছিল না। একটা গোষ্ঠীর নানা আকারের নানা ও স্বভাবের বহু প্রাণীকে ডাইনোসোর আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। ওদের আবির্ভাব হয়েছিল প্যালিওজোয়িক মহাযুগের শেষভাগে। সমগ্র মেসোজোয়িক মহাযুগটাকে ওরা নিজদের অধিকারে রেখেছিল। তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় সাত কোটী বছর আগে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ট্রায়াসিক যুগে আবিভূর্ত থেকোডেণ্ট নামে একজাতীয়

সরীসৃপ থেকে ওদের উৎপত্তি। থেকোডেটরা আবার দুটি শাখায় বিভক্ত ছিল, সরিশ্চিয়া ও অরিশ্চিয়া। শাখা দুটির উপশাখাও ছিল। সরিশ্চিয়াদের তিনটি উপশাখা যথাক্রমে থেরোপডা, সরোপডা ও প্যালিওপডা এবং অরিশ্চিয়াদের উপশাখা চারটির নাম ছিল অর্ণিথোপড, স্টেগোসোর, আংকিলোসোর ও সেরাপসিয়ান।

আবির্ভাবকালে ওরা কিন্তু কেউই অতিকায় ছিল না। খুব জোর পাঁচ থেকে ছ মিটার পর্যন্ত লম্বা হত। প্রায় তিন কোটি বছর পরে জুরাসিক যুগেই ওরা অতিকায় হতে আরম্ভ করে। অবশ্য সে যুগটাই ছিল অতিকায়ের যুগ এবং অধিকাংশ প্রাণী ছিল সরীসৃপ জাতীয়। জলে, স্থলে ও আকাশে সর্বত্র বিচরণ করতো সরীসৃপদের কোন না কোন জাত ভাই।

তবে অধিকাংশ ডাইনোসোর ছিল উভচর। কিন্তু জলে বেশীক্ষণ ডুবে থাকতে পারতো না। তাদের মধ্যে থরোপডারা ছিল সুবৃহৎ মাংসাশী প্রাণী। এই শাখার একটি প্রজাতির নাম ছিল টিরানোসেরাস। উচ্চতায় ৬ মিটারের মত, দৈর্ঘ্যে ১২ থেকে ১৪ মিটারের মত এবং ওজনে ছিল ৮ টনের কাছাকাছি। যেমন ছিল চেহারা, তেমনিই রাক্ষুসেও ছিল। ছোট ছোট ডাইনোসোরদের ভক্ষণ করতে দ্বিধাবোধ করতো না।

টিরানোসেরাসদের চেয়েও অতিকায় ছিল সরোপোডা শ্রেণীর উদ্ভিদভোজী ডাইনোসোররা। সরোপোডাদের গলা এত লম্বা ছিল যে, আজকের দিনে যে কোন বড় গাছের মগডাল থেকে অনায়াসে পাতা ছিঁড়ে খেতে পারতো। এই জাতের একটি প্রজাতি লম্বায় হতো ২৪ থেকে ২৭ মিটার এবং ওজনে হতো ৫০ টনের মত। আর তাদের গলাটাই শুধু লম্বা ছিল ৬ মিটারের বেশী। নাম তাদের ব্রন্টোসেরাস। রূপকথার সেই সব বিশালকায় দৈত্যও এদের কাছে হার মানে।

সব শ্রেণীর ডাইনোসোরদের মাথা ছিল খুবই ছোট। মাথায় মগজও তাই কম ছিল। আর ঐ কারণেই মনে হয় ঘটে বুদ্ধি ছিল না এক ফোঁটাও। নাকের ফুটোটি থাকতো মাথার অনেক উপরে। সামনের পা দুটি ছিল নিতান্ত ছোট, হাঁটতো পিছনের দুটি পা এবং লেজের উপর ভর দিয়ে। উদ্ভিদভোজী ডাইনোসোররা আবার অধিকাংশ সময় নাকের ফুটোটি জলের উপর রেখে হ্রদে কিংবা বড় বড় জলাভূমিতে পড়ে থাকতো।

শুধু ব্যতিক্রম ছিল অনিশ্চিয়া শাখার ডাইনোসোররা। চেহারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। গায়ের চামড়া ছিল বেশ পুরু—অনেকটা আজকের দিনের গণ্ডারের চামড়ার মত। অধিকাংশের মুখে পাখীর ঠোঁটের মত ঠোঁট ছিল।

তবে সে ঠোঁট চামড়ারই ছিল। কারও কারও বা শিং গজাতো।

অনিশ্চিয়াদেরও চারটে করে পা থাকতো। তবে সব পা হতো একই মাপের। পিঠে থাকতো খুব বড় বড় কাঁটা। কারও কারও বা পিঠে সুদীর্ঘ কাঁটার ঝালরের মত উপর দিকে খাড়াভাবে থাকতো। এই শাখার ডাইনোসোরদের নাম ছিল ক্যাম্পটোসেরাস, স্টেগোসেরাস, অ্যাঙ্কলিসেরাস, ট্রাকোডন ইত্যাদি। ক্যাম্পটো-সেরাসদের মুখ পাখীর ঠোঁটের মত হতো এবং ট্রাকোডনের মুখ হতো হাঁসের ঠোঁটের মত। অথচ অ্যাঙ্কলিসেরাসদের চেহারা ছিল আজকের কুমীরের প্রায় কাছাকাছি।

অপরদিকে প্যালিওপোডা শাখার ডাইনোসোরদের ক্ষেত্রেও অল্প-স্বল্প ব্যতিক্রম ছিল। এরাও ছিল আমিষভোজী। পেছনের পা দুটো একটু বড় হতো বটে কিন্তু সামনের পায়ের সঙ্গে একেবারে বেমানান ছিল না। তাই হাঁটতো এরা কখনও দু-পায়ে এবং কখনও চার-পায়ে।

ডাইনোসোরদের সব শাখাই হারিয়ে গেছে আজ থেকে প্রায় সাতকোটি বছর আগে। তবুও দু-একটি প্রজাতির বংশধারা এখনও টিকে আছে পৃথিবীর বুকে। তাদের মধ্যে অনিশ্চিয়া শাখার হাঁসের ঠোঁটের মত ঠোঁটবিশিষ্ট ট্রাকোডন বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করতে করতে পরিণত হয়েছিল হংসচঞ্চু বা প্লাটিপাস রূপে এবং থেরোপোডা শাখা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল কোমোডো ড্রাগন। হংস-চঞ্চুরা এসেছিল আজ থেকে প্রায় সাতকোটি বছর আগে। আর কোমোডো ড্রাগনরা এসেছিল আজ থেকে পাঁচকোটি বছর আগে। তবু এখনও তারা টিকিয়ে রেখেছে তাদের বংশধারা এবং বজায় রেখেছে তাদের সেই আদিম রূপটাও। বর্তমানে তাই এরাও আমাদের চোখে এক একটি বিস্ময়।

হংসচঞ্চু বা প্লাটিপাস—[বর্গ—মনোট্রিমেটা, শ্রেণী—পোটোথেরিয়া, বৈজ্ঞানিক নাম—অরনিথোরিংকাস]

সরীসৃপরা ছিল ডিম্বপ্রসবী। ওরা ডিম পাড়তো এবং ডিম ফুটে একদিন বাচ্চা বেরুতো। সেই বাচ্চার দরকার হতো না মায়ের দুধ পান করার। ডিম ফোটার জন্য অবশ্য বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন হতো। কিন্তু মেসোজোয়িক মহাযুগের শেষভাগে আর পূর্ব পরিবেশ রইল না। তারপর কেনোজোরিক মহাযুগের প্রথমভাগে একেবারে নতুন পরিবেশের সূচনা হয়েছিল। সেই অবস্থায় পূর্ব পরিবেশে অভ্যস্ত প্রাণীদের ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলো।

প্রতিকূল পরিবেশে অবশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে সূচিত হলো বিবর্তন। সেই বিবর্তনের ধারায় একদিন আত্মপ্রকাশ করলো ডিম্বপ্রসবী ও স্তন্যপায়ী—এই উভয়ের মধ্যবর্তী স্তরের নানা জীব। উক্ত স্তরের বহু প্রাণীর জীবাশ্ম বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছে। তারা হারিয়ে গেছে অনেক—অনেককাল আগে। শুধু টিকে আছে মাত্র একটি বর্গের গুটিকয়েক জীব। নাম তাদের প্লাটিপাস। বিষেজ্ঞদের মতে আজ থেকে সাতকোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জয়যাত্রার যে শুভ সূচনাটি হয়েছিল, তার মূলে ছিল এই জাতীয় প্রাণীরা। কারও কারও মতে এদের আবির্ভাবকাল জুরাসিক যুগ। সেই থেকে প্রায় পনেরকোটি বছর ধরে তারা অব্যাহত রেখেছে আপন বংশধারা। বজায় রেখেছে তাদের আদিম রূপটিও। ওদের জীবাশ্মও পাওয়া গেছে অনেক।

জীবন্ত জীবাশ্মরূপে খ্যাত এই প্রাণীরা আমাদের কাছে আর এক বিস্ময় এবং বিজ্ঞানীদের কাছে পরম লোভনীয়। বিস্ময়ের কারণ, এরা ডিম পাড়ে অথচ ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে সেই বাচ্চা মায়ের দুধ পান করে বড় হয়। অপরদিকে বিজ্ঞানীদের কাছে লোভনীয় এই কারণে যে, পৃথিবীতে এই একটিমাত্র জীব আছে —যে ডিম্বপ্রসবী ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে একটা সেতু বিশেষ। জীবাশ্ম বিশেষজ্ঞরা জীবাশ্মকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে একদিন যা কল্পনা করেছিলেন, তা চোখের সামনে দেখার সুযোগ পেলেন। সাতকোটি বছর আগে যাদের হারিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাদের কাছে পাওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্যে পুলকিত ও উৎফুল্ল তাঁরা।

প্লাটিপাসদের নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানীরা এবং বছরের পর বছর লক্ষ্য করেছেন ওদের জীবনযাত্রা প্রণালী। ওদের বাসস্থান একমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে। তাও আবার সেখানে সর্বত্র ওদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। একমাত্র দক্ষিণ ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়া এবং টাসমানিয়া অঞ্চলের নদনদী-গুলিতে চোখে পড়ে।

প্রাণীটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যথাক্রমে—ওরা জলে ঘুরে বেড়ায় অথচ গায়ে তেলতেলে পালকের পরিবর্তে আছে ঘন লোম, মুখটা একেবারে হাঁসের ঠোঁটের মত—অথচ ঠোঁট চামড়া দিয়ে তৈরি নয়, বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করে অথচ মায়ের বুকে স্তন্যের কোন বোঁটা নেই। লোমশ লেজও একটি আছে।

প্লাটিপাসের চামড়া দিয়ে তৈরি হাঁসের ঠোঁটের মত ঠোঁটটাকে দেখলে মনে হয়, কে যেন নাক ও ঠোঁটদুটিকে জোর করে টেনে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অথবা কৃত্রিম একটা ঠোঁট মুখের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাঁসের মত ঠোঁট বলে ওর ইংরাজীতে নামকরণ করা হয়েছে ডাকবিল এবং শব্দটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করলে হয় হংসচঞ্চু।

হংসচঞ্চুরা খুব বড় আকারের প্রাণী নয়। লেজসমেত লম্বায় মাত্র দু ফুটের মত এবং লেজটা লম্বায় প্রায় ৬ ইঞ্চি। ওজনে এক একটি ২ কিলোগ্রামের কাছাকাছি। চারটে ছোট ছোট পা আছে এবং সামনের পা-দুটির পাতা একেবারে হাঁসের পায়ের পাতার মত জোড়া দেওয়া। কিন্তু পেছনের পা-দুটি তেমন নয়। প্রত্যেকটি পায়ে আছে পাঁচটি করে সুতীক্ষ্ণ নখর।

হাঁসের ঠোঁটের মত ঠোঁট হলেও ঠোঁটের উপাদান এবং রঙ হাঁসের মত নয়। উপরের ঠোঁটটা বেগুনি এবং নিচের ঠোঁটটা হলদের উপর ছোপ ছোপ কালো দাগ। ওরা জলে সাঁতার কাটে, জলে ডুবে খাবার খুঁজে খায়, তবে একনাগাড়ে বেশীক্ষণ জলে ডুবে থাকতে পারে না। পানকৌড়িদের মত ডুব দেয় এবং কিছুক্ষণ ডুবে ঘুরে বেড়ানোর পর শ্বাস নেওয়ার জন্য জলের উপর ভেসে উঠে। হাঁসদের মতই ওরা ছোট ছোট মাছ, শামুক, গুগলি, কাঁকড়া ইত্যাদি খেয়ে থাকে। ঠোঁট দুটি বেশ অনুভূতি সম্পন্নও। জলের ভেতরে ঐ ঠোঁটের সাহায্যেই তারা বুঝে নেয় কোনটি কি জিনিস।

প্লাটিপাসদের গায়ের রঙটাও ভারি চমৎকার। লোমশ শরীর। পিঠটা গাঢ় বাদামী বর্ণের অথচ পেটের তলাটা সাদা অথবা হলদে। গায়ের লোমগুলো মোটা হলেও বেশ নরম—অনেকটা যেন মখমলের মত। চোখ এবং কানেরও বেশ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পশুদের কানের মত ওদের কান লম্বা নয় এবং বাহিরের দিকে বেরিয়েও থাকে না। মাথায় ঘন লোমের ভেতরে দুপাশে দুটি কানের ছিদ্র এবং তাতে পর্দার ব্যবস্থা। চোখেও পর্দা থাকে। যখন জলে ডুব দেয়, তখন আপনা হতে চোখ ও কানের পর্দাগুলো নেমে আসে আর চোখ ও কানকে ঢেকে ফেলে।

পুরুষ হংসচঞ্চুদের আরও বৈশিষ্ট্য একটু আছে। পুরুষদের পেছনের পায়ের নখরগুলো নিরেট নয়। ভেতরটা একটু ফাঁপা এবং ফাঁপা অংশের সঙ্গে বিষথলি যুক্ত থাকে। এটিকে তারা আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। শত্রুকে সামনে পেলে নখর দিয়ে আঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষ ঢেলে দেয়। সেই বিষ বেশ তীব্রও। বিষের জ্বালায় বড় বড় প্রাণীরা না হলেও ছোট ছোট প্রাণীরা মারা যায়। কিন্তু স্ত্রী হংসচঞ্চুদের এমন বিষনখর থাকে না।

পাখীদের মত হংসচঞ্চুরা প্রচুর আহার করে। পেটে ক্ষিধে যেন সবসময় লেগে আছে। তবে নিশাচর এরা। কেবল মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় ও ভোরে নদীতে ঘুরতে দেখা যায়। দিনের বেলায় আশ্রয় গ্রহণ করে নদীতীরে গর্তের ভেতরে।

প্লাটিপাসরা নিজেরাই গর্ত খুঁড়ে আস্তানা বানায়। গর্তের মুখ থাকে

অনেকগুলি। অনেকটা আমাদের দেশের খেঁকশেয়ালদের গর্তের মত। তবে খেঁকশেয়ালদের গর্ত অপেক্ষাও প্লাটিপাসদের গর্ত অনেক আঁকাবাঁকা—ঠিক যেন গোলকধাঁধার মতই। একটি মুখ দিয়ে শত্রু ঢুকলে আঁকাবাঁকা পথে শত্রু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় আর ততক্ষণে প্লাটিপাস অন্যমুখ দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে জলে নেমে পড়ে বা অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই শত্রুরা সহজে হদিশ পায়না এদের।

ডিম পাড়ার প্রাক্কালে স্ত্রী প্লাটিপাসরা আরও অদ্ভুত ধরনের গর্ত বানায়। আরও আঁকাবাঁকা এবং আরও শাখা প্রশাখা যুক্ত করে তোলে। অবশেষে একটি শাখা গর্তের শেষে ঘাস-পাতা ইত্যাদি পাতিয়ে অনেকটা গদির মত করে নেয়। মা হংসচঞ্চু যখন ডিম পাড়ার জন্য গর্তে প্রবেশ করে তখন এমনভাবে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে যায় যে, শাখাগর্তগুলির মুখগুলো গুঁড়ো মাটিতে আলতোভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাহির থেকে বাতাস প্রবেশ করতে যেমন অসুবিধা হয়না তেমনই শত্রুর চোখেও ধুলো দেওয়া যায়।

মা-হংসচঞ্চুরা একসঙ্গে একটি, দুটি অথবা তিনটি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসে না। ডিমে তা দিতে থাকে এবং একনাগাড়ে বেশ কয়েকটা দিন ঘুমিয়ে নেয়। ডিম পাড়ার আট থেকে দশ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বার হয়। সদ্যোজাত বাচ্চাদের গায়ে লোম থাকে না এবং চোখও ফোটে না। অনেকটা ইঁদুরদের বাচ্চার মতই লোমহীন ও চোখহীন। ঠিক এই সময়টা বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করে বেঁচে থাকে।

একটা মজার কথা, মা-হংসচঞ্চুদের বুকে স্তনের মত কোন কিছু থাকে না। এমনকি ক্ষুদ্র একটা বোঁটাও নয়। বুকে থাকে কতকগুলো ছিদ্র। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে বাচ্চারা মায়ের বুক চাটতে থাকে। ফলে কতকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের মাধ্যমে দুধ ক্ষরিত হয়। সেই দুধ চেটে চেটেই খায় বাচ্চারা। এই বৈশিষ্ট্যটুকু পৃথিবীর অপর কোন প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না।

বাচ্চাদের প্রথমে উপরে ও নিচের চোয়ালে যথাক্রমে তিনজোড়া ও দুজোড়া করে দাঁত থাকে। বড় হলে ঐ দাঁতগুলো উপরের দিকে বেঁকে যায়। এক একটা হংসচঞ্চু বাঁচে দশ থেকে পনের বছর পর্যন্ত।

অস্ট্রেলিয়াও একদিন মূল স্থলভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বহন করেছিল সে আমলের অদ্ভুত অদ্ভুত সব জানোয়ারকে। তাদের মধ্যে ঐ প্লাটিপাসরা অন্যতম। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘকাল সভ্য মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার জন্য প্লাটিপাসদের চলছিল একইভাবে জীবনযাত্রা। কিন্তু যখনই পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা সেখানে ভিড় করলো তখনই ঘনিয়ে

উঠলো তাদের দুর্দিন। সভ্যতার উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত অনেকেই তাদের উপর নিক্ষেপ করলো লুব্ধ দৃষ্টি। এন্তার হত্যা করে লোম ও চামড়াকে রপ্তানি করতে লাগলো ইওরোপে। ফলে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেল হংসচঞ্চুরা।

কিছুকাল পরেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, আশ্চর্য এই জীবটি পৃথিবীর বর্তমান জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। অতীতের হারিয়ে যাওয়া জীবদের মধ্যে এটিও অন্যতম। তখনই সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। সরকার আইন করে হংসচঞ্চু হত্যা নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু ততদিনে শেষ হয়ে গেছে অধিকাংশ। যে গুটিকয়েক বেঁচে ছিল তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলো।

বর্তমানে ওদের আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। ধীরে ধীরে বংশ বাড়িয়ে ফেলেছে। ঘুরছে আগেকার সেই নদীগুলিতে এবং বাসা বাঁধছে। বড় চঞ্চল ও বড় আমুদে ওরা। সন্ধ্যায় কিংবা সকালে জোড়ায় জোড়ায় যখন নদীতে বিচরণ করে, টুপ টুপ ডুব দিয়ে খাবার খুঁজে খায়, পাগুলো ছড়িয়ে জলের উপর যখন ভেসে থাকে, তখন নদীর তীরভূমি প্রাণচাঞ্চল্যে একেবারে ভরপুর হয়ে উঠে। দর্শকের দৃষ্টি আপনা হতে নিবদ্ধ হয় তাদের দিকে। বড় অদ্ভুত এরা এবং বড় অদ্ভুত এদের আচরণ!

অঙ্ক গর্ভ প্রাণী

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, প্লাটিপাসকে ডিম্বপ্রসবী সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মাঝামাঝি স্তর রূপে ধরা হলেও এদের থেকে পুরোপুরি স্তন্যপায়ীরা আসতে পারে নি। প্রকৃত স্তন্যপায়ীরা এসেছে অনেক পরে—বিবর্তনের হাজার হাজার স্তর অতিক্রম করে। বেশ কিছু স্তরের জীবাশ্ম অবশ্য পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে একটি বিশেষ স্তরের কয়েকটি জীবন্ত নমুনা। ওরা অঙ্ক গর্ভ প্রাণী এবং পৃথিবীতে বিরল প্রাণীদের অন্যতম। বিজ্ঞানীরা এদের মার্সুপিয়াল বর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পৃথিবীর এখানে ওখানে বেশ কয়েকটি প্রজাতির দেখা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কাঙ্গারু, ওপোসাম ও কোয়েলার কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। কাঙ্গারু ও কোয়েলা দুটি প্রজাতিকে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ায় এবং ওপোসামকে দেখা যায় উত্তর আমেরিকার পাহাড়ী এলাকায়। তবে জীবন্ত জীবাশ্ম ওরা কেউ নয়।

কাঙ্গারু—কাঙ্গারুরা অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ঘন অরণ্যে বাস করে।

অস্ট্রেলিয়ায় অবশ্য বহু অদ্ভুত ধরনের জীব দেখা যায়। কাঙ্গারুও সেই অদ্ভুতদের মধ্যে একটি। চিড়িয়াখানায়ও দেখা যায় এদের।

কাঙ্গারুদের সামনের পা-দুটি পেছনের পায়ের তুলনায় বেশ ছোট। পেছনের পা-দুটিতে ও লেজে ভর দিয়ে ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। যখন বিশ্রাম করে তখন সামনের পা-দুটো গুটিয়ে রাখে। মুখটা দেহের অনুপাতে বেশ ছোট এবং লেজটা দীর্ঘ। এদের পায়ে কতকগুলি সুতীক্ষ্ণ নখরও থাকে। এক জাতের কাঙ্গারু গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতেও পারে। ওরা উদ্ভিদভোজী।

স্ত্রী কাঙ্গারুদের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, ওদের পেটের তলায় একটি থলি থাকে। এরা অপুষ্ট সন্তানের জন্মদান করে। সেই সন্তান আশ্রয় গ্রহণ করে মায়ের পেটের তলায় থলিতে। মায়ের দুধ পান করতে করতে পুষ্ট হয়ে উঠলেই থলি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। দলবদ্ধ হয়ে বাস করে এরা।

ওপোসাম—উত্তর আমেরিকার পাহাড়ী অঞ্চলের বাসিন্দা ওপোসামরা দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের বেড়ালদের মত। ছাই রঙের শরীরের উপর হলদে ও খয়েরি রঙের ছোপ থাকে। এরা অত্যন্ত ভীতু ও বোকাসোকা ধরনের। গাছের কোটরে কিংবা পাহাড়ের গর্তে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বাস করে এরা।

ওরাও অক্ষ গর্ভ প্রাণী তথা মার্সুপিয়াল বর্গের অন্তর্ভুক্ত। মা-ওপোসাম কাঙ্গারু অপেক্ষাও অপুষ্ট সন্তান প্রসব করে এবং আশ্রয় দান করে বুকের তলার থলিতে। একসঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা প্রসব করে এবং স্তন্যদান করে বাঁচিয়ে রাখে।

ওপোসামদের বাচ্চারা কিন্তু কাঙ্গারুর বাচ্চাদের মত এত সহজে মায়ের থলি ছাড়ে না। একেবারে পূর্ণবয়স্ক হলেই বেরিয়ে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা হয়ে বসে।

ওপোসামরা ভয়ানক অলস এবং শীতঘুমে অভ্যস্ত। সারা শীতকালটাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। নিজে কিন্তু বাসা তৈরি করতে পারে না। গাছের কোটরে বা পাহাড়ের খাঁজে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কোয়েলা—মার্সুপিয়াল বর্গের অন্তর্গত অক্ষ গর্ভ প্রাণী কোয়েলারা আরও অদ্ভুত ধরনের জীব। অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যের বাসিন্দা পৃথিবীর অন্যতম বিরল প্রাণী কোয়েলারা ওপোসামদের চেয়েও কুঁড়ে। এত কুঁড়ে যে দু-চারটি গাছে ঘুরে বেড়াতেই তাদের সারা জীবনটা কেটে যায়।

সাধারণত কয়েক জাতের ইউক্যালিপটাস গাছে ওরা বাস করে এবং সেই গাছের পাতা খেয়েই বেঁচে থাকে। সবসময় যেন একটা ঘুম ঘুম ভাব। মনে হয়, যেন নেশায় চুর হয়ে আছে।

সবসময় ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা খাওয়ার জন্যই হয়ত তাদের গায়ে একটা বিকট গন্ধ লেগে থাকে। ঐ গন্ধটিকে তাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার রূপে গ্রহন করা যেতে পারে। যেমন আমাদের দেশে ছুঁচোর গায়ে গন্ধ থাকার জন্য তাকে কেউ আক্রমণ করে না। নিতান্ত ক্ষুদ্র জীব হওয়া সত্ত্বেও নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে ছুঁচোর গন্ধ দুর্গন্ধেরই নামান্তর। কোয়েলাদের গায়ের গন্ধ এতটা বিদঘুটে না হলেও অপরাপর জন্তুজানোয়ারের কাছে অসহ্য। ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা ছিঁড়লে যে গন্ধটি পাওয়া যায় অনেকটা সেই ধরনেরই গন্ধ এবং ঐ গন্ধের জন্য কেউ তাদের ধারে পাশে আসে না। আর ওরাও দিব্যি কুঁড়ের বাদশার মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।

কোয়েলারা বিরল প্রাণী। একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। প্রাণীটা আকারেও তত বড় হয় না। পূর্ণবয়স্ক এক একটি কোয়েলার ওজন দশ কিলোগ্রামের বেশী হয় না।

স্ত্রী কোয়েলা একসঙ্গে মাত্র একটি অপুষ্ট সন্তান প্রসব করে। কদাচিৎ দুটি। ওদের সদ্যোজাত সন্তান এত ক্ষুদ্র যে ইঁদুরের বাচ্চার সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। লম্বায় মাত্র দু সেন্টিমিটারের মত এবং ওজনে ছ-গ্রামের বেশী নয়। ঐ বাচ্চাকে মা-কোয়েলা থলিতে রেখে বুকের স্তন্য দান করে। বড় ও স্বাবলম্বী হলে বাচ্চারা মায়ের বুকের থলি থেকে বেরিয়ে আসে।

কোয়েলাদের চামড়া ভারি লোভনীয়। তাই একদিন ওদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হতো। পরে বিরল এই প্রাণীটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য আইন করা হয়েছে। তাই নিশ্চিহ্ন হতে হতে কোন প্রকারে টিকে গেছে কোয়েলারা।

* কোমোডো ড্রাগন *

জীবন্ত জীবাশ্ম কোমোডো ড্রাগনদের উপস্থিতির কথা পৃথিবীর মানুষ দীর্ঘকাল টের পায় নি। এদের অস্তিত্বের কথা প্রথমে প্রকাশ করেন একজন মার্কিন বৈমানিক। ১৯১২ সালে বৈমানিকটি এক বিমান দুর্ঘটনায় কোনপ্রকারে প্রাণে বেঁচে যান এবং পরিত্যক্ত হন ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত কোমোডো নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে।

দ্বীপটি ছিল সম্পূর্ণ জনহীন। কয়েকমাস সেই নির্জন দ্বীপে অবস্থান করার পর আমেরিকাগামী একটি জাহাজ তাঁকে উদ্ধার করে। বৈমানিকটি অতঃপর

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর নির্জন বাসের কথা বন্ধুবান্ধবদের বলেন এবং সেই সঙ্গে দ্বীপটিতে বসবাসকারী এক অদ্ভুত জানোয়ারের গল্প করেন। তিনি বলেছিলেন, জানোয়ারটি এত ভয়ঙ্কর ও রাক্ষুসে যে, যাকে সামনে পায় তাকেই টুপ করে গিলে ফেলে। যখন পথে হাঁটে তখন মুখ থেকে নির্গত হয় ঝলকে ঝলকে আগুন। গল্পে পড়া অদ্ভুত জানোয়ার সেই ড্রাগনদের মতই।

কথাটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল নানা জায়গায়। কিন্তু প্রথমে কেউ আস্থা স্থাপন করতে পারে নি বৈমানিকটির কথায়। অনেকেই ভেবে নিল ভদ্রলোক হয় গাঁজাখুরি গল্প ফেঁদেছেন, নতুবা দীর্ঘকাল নির্জনে অতিবাহিত করায় মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

দুঃসাহসিকরা কিন্তু গল্পটাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন না। তাঁরা ভাবলেন, ভদ্রলোক বাড়িয়ে বলতে পারেন কিন্তু নিছক মিথ্যে হতে পারে না। তাই প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কিছুকাল অভিযাত্রীদের একটি দল কোমোডো দ্বীপে যাত্রা করলেন।

অভিযাত্রীরা কোমোডো দ্বীপে অবতরণ করেই দেখা পেলেন সেখানকার অতি অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর জানোয়ারদের। লম্বায় এক একটি ১০ থেকে ১৫ ফুটের মত। যখন হাঁটে তখন তাদের লকলকে বিরাট জিভটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে। কমলা রঙের, দেখলে সত্যই আগুনের শিখা বলে ভ্রম হয়। সাপদের মতই জিভ বার করা যেন স্বভাব তাদের।

সাপদের মত জিভ থাকলেও বুকে হাঁটে না। শক্ত সমর্থ চার-চারটে পা আছে। চেহারাটাও বেশ নাদুস-নুদুস। লেজটা এত বড় ও মোটা যে, পথ হাঁটতে গেলে লেজটাকে মাটিতে ঠেকিয়ে টানতে টানতে এগিয়ে যেতে হয়। লেজটার শক্তিও বড় প্রচণ্ড। লেজের এক একটা ঝাপটায় এক একটা বুনো শূওরকেও মুহূর্তে কাবু করে ফেলতে পারে।

জানোয়ারগুলিকে দেখে অভিযাত্রীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেশের মানুষ তাদের কথাকেও নিছক গল্প হিসেবে উড়িয়ে দিতে পারে, এই ভেবে জানোয়ারগুলোর অনেকগুলি ফটোও গ্রহণ করলেন। তারপর দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফটো সহ প্রকাশ করলেন জানোয়ারগুলোর বৈশিষ্ট্যের কথা।

এবার পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে একটা বড় রকমের সাড়া পড়ে গেল। দলে দলে অভিযাত্রীরা ছুটলেন কোমোডো দ্বীপের অদ্ভুত জানোয়ারদের প্রত্যক্ষ করার জন্য। আর ফ্রান্সের এক সিনেমা কোম্পানী করলো কি? একটি ছবি তৈরি করার জন্য দলবল নিয়ে ছুটে গেল দ্বীপটিতে।

বহু অর্থ ব্যয়ের পর কোম্পানীটি একদিন উপহার দিল অদ্ভুত এক ছবি। নাম

দিল "কোমোডো ড্রাগন"। এবার রীতিমত সাড়া পড়ে গেল দেশে দেশে। বলা বাহুল্য, জানোয়ারদের নামকরণে ঐ সিনেমা কোম্পানীর দেওয়া নামই বহাল রইলো।

এতদিনে টনক নড়লো বিজ্ঞানীদেরও। জানোয়ারটির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের জন্য তাঁরা হলেন যত্নবান। প্রথমে এগিয়ে এলেন ইন্দোনেশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকজন জীববিজ্ঞানী। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় তাঁদের কয়েকজনের একটি দল প্রথমে কোমোডো দ্বীপ এবং তার আশেপাশে অন্যান্য দ্বীপগুলিতে অনুসন্ধান চালালেন। জানোয়ারদের প্রত্যক্ষ করলেন এবং কোমোডো দ্বীপ ছাড়াও কয়েকটি দ্বীপে তাদের সন্ধান পেলেন।

এবার শুরু হলো গবেষণা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অতীতের জীবজন্তুদের যে সব জীবাশ্ম তাঁদের হস্তগত হয়েছে সেগুলির সঙ্গে জানোয়ারটির অবয়ব মেলাতে গিয়ে দেখলেন, একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই পাওয়া গেছে এদের জীবাশ্ম এবং সংখ্যাও নিতান্ত কম। জীবাশ্ম হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন নির্ধারিত হয়েছিল, প্রায় ৬ কোটি বছর আগে ওলিগোসিন যুগে সরীসৃপদের কোন একটি শাখা থেকে এক-মাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই ওদের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই অস্ট্রেলিয়াতে বিস্তর খোঁজা-খুঁজির পরও যখন আস্ত জানোয়ারটিকে দেখা গেল না তখনই স্থির করা হয়েছিল অপরাপর জানোয়ারদের মত এরাও হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজ অস্ট্রেলিয়া থেকে বহুদূরে ওদের সন্ধান পেয়ে বিজ্ঞানীরা রীতিমত বিস্মিত হলেন। জীবাশ্ম অস্ট্রেলিয়াতে আর ওরা এখানে! কেমন করে সম্ভব হয়েছে!

জানোয়ারগুলোর সম্বন্ধে সঠিক তথ্য উদ্ধারের জন্য এবার থেকে প্রেরণ করা করা হলো অভিযানের পর অভিযান। ১৯৬১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইন্দো-নেশিয়ার বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত একটি দল কয়েকটি হরিণ সংগ্রহ করে ছুটলেন সেখানে। একদিন একটি হরিণকে হত্যা করে ফেলে দিয়ে এলেন জঙ্গলের মধ্যে এবং তাদের কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করার জন্য লুকিয়ে রইলেন এক জায়গায়।

অল্প পরেই দুটো ড্রাগন ছুটে এল মরা হরিণটার পাশে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মন দিল আহারে। সে কি আহার? এমনভাবে যে কেউ খেতে পারে তা তাঁদের কল্পনারও অগোচর ছিল। এক এক খাবলে খসিয়ে আনছে গাদাখানেক মাংস এবং না চিবিয়েই গিলে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজনে শেষ করে ফেললো বিরাট হরিণটাকে। হাড়, শিং, খুর, কোন কিছুকে বাদ দিল না। এমন সাফ করে ফেললো যে, সেখানে কিছুক্ষণ আগে যে একটা মরা হরিন পড়েছিল তার কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না।

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন পৃথিবীতে যত প্রাণী বাস করে তাদের মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশী লোভী এবং রাক্ষুসে। এবার হরিণের লোভ দেখিয়ে তাঁরা বেশ কয়েকটিকে বেঁধে ফেললেন।

এবার শুরু হলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রথমে ওদের একটিকে জাহাজে করে নিয়ে গেলেন তাঁরা দূর সমুদ্রের বুকে। সেখানে বাঁধন কেটে জানোয়ারটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন, দিব্যি তর তর করে জল কেটে ছুটে চললো সেই কোমোডো দ্বীপের দিকে। জাহাজটিও তাকে অনুসরণ করলো। ড্রাগনটি আদৌ ভুল করলো না পথ। একসময় স্বচ্ছন্দে জল থেকে উঠে জঙ্গলে গা ঢাকা দিল।

এই পরীক্ষাটি থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, অতীতের সেই সব ডাইনোসোরদের মতই ওরা জলে ও স্থলে উভয় জায়গায় বিচরণ করার ক্ষমতা রাখে। অস্ট্রেলিয়া থেকে বহুদূরে এই কোমোডো দ্বীপে ওরা কেমন করে যে এল, তাও এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। অতীতে কোন কারণে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ওদের কেউ কেউ সাগর সাঁতরে ছুটে এসেছিল এবং আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এখানে ওদের কোন শত্রু নেই। খাদ্যও পর্যাপ্ত। তাই টিকে থাকতে কোন অসুবিধা হয় নি। ড্রাগনদের পর্যাপ্ত জীবাশ্ম না পাওয়ার কারণ নির্ণয় করা হলো। ওরা এমন রাক্ষুসে যে, ওদের কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহকেও নষ্ট হতে দেয় না। সবাই মিলে পরমানন্দে ভোজন করে। যেহেতু হাড়-গোড় সবকিছুকে গিলে ফেলে, অতএব জীবাশ্ম আসবে কোথা থেকে ?

বিজ্ঞানীরা যেসব ড্রাগনদের বন্দী করেছিলেন, তাদের মাত্র দুটিকে বিজ্ঞানেরই কারণে হত্যা করা হয়েছে। শব ব্যবচ্ছেদের পর জানা গেছে, ওরা মনিটার লিজার্ড জাতের জন্তু। পৃথিবীর অন্য কোথাও বর্তমানে ওদের কোন স্বজাতিও নেই। এরা সরীসৃপদের বংশধর হলেও তথাকথিত সেই ডাইনোসোরদের কেউ নয়। তবে ডাইনোসোরদের মতই ভয়ঙ্কর পেটুক। ছোট ছোট ইঁদুর থেকে বড় বড় শূকর পর্যন্ত সবাইকে ওরা ভক্ষণ করে। এরা গাছে চড়তেও ওস্তাদ। গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে এবং পাখী ও বানরদের নাগালের মধ্যে গেলে টুপ করে গিলে ফেলে।

ওদের হারিয়ে না যাওয়া এবং বিবর্তন না আসার কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ওদের বসবাস সেখানে ওদের কোন শত্রু নেই। খাদ্যও যথেষ্ট পাচ্ছে। কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় নি কোন দিনই বা শত্রুরও মোকাবিলা করতে হয় নি। তাই অব্যাহত আছে ওদের বংশধারা এবং অটুট আছে ওদের জীবনধারা।

কোমোডো দ্বীপের এই ড্রাগনরা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বেঁচে থাকে। এক একটি পূর্ণবয়স্ক ড্রাগনের ওজন ১৫০ কিলোগ্রামের মত। ওরা ডিম্ব প্রসবী। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ডিম পাড়ে। কিন্তু ডিমে তা দেয় না। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলেই আহারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। ডিমের আকারও খুব বড় হয় না। সাধারণ হাঁসের ডিম থেকে একটুখানি বড় হয় মাত্র।

বিজ্ঞানীরা যেসব ড্রাগনকে বন্দী করেছিলেন তাদের দুটিকে হত্যা করার পর বাদবাকিকে ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষের চাপে যাতে ওদের বংশ লুপ্ত হতে না পারে তার জন্য একটা বিশেষ অরণ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় এক হাজারেরও বেশী ড্রাগন সেখানে থাকে এবং নিয়মিত তাদের খাদ্য সরবরাহ করা হয়। ইন্দোনেশিয়ার চিড়িয়াখানায়ও রাখা হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই ড্রাগনকে। ওদের আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী

সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে তিমি, ডলফিন, ডুগং, ম্যানটি, সীল, ওয়ালরাস প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি প্রজাতির প্রাণীরাই স্তন্যপায়ী। জলে এরা বাস করে তবু মাছ এরা নয়। আবার জীবন্ত জীবাশ্মরূপেও ওদের গণ্য করা হয় না। এদের আবির্ভাব হয়েছিল বহুকোটি বছর আগে। বিরলও নয় এরা। সভ্যতার আদি-পর্ব থেকে মানুষের সঙ্গে এদের পরিচয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে উপরোক্ত প্রাণীগুলি বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করতে করতে একদিন স্তন্যপায়ীতে পরিণত হয়েছিল। উভচর থেকে পরিণত হয়েছিল স্তন্যপায়ীতে। আবির্ভাবকাল আজ থেকে প্রায় সাতকোটি বছর আগে। সে সময়টা আবার পৃথিবীর বুকে চলছিল ঘন ঘন দুর্যোগ। বিশেষ করে ক্রিটেসিয়াম যুগ থেকে প্লিওসিন যুগ পর্যন্ত কয়েক কোটি বছর ধরে একটানা না হলও দুর্যোগ-পূর্ণ আবহাওয়া এসেছে বার বার। কখনও স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কখনও পৃথিবীর বুকে জমে উঠেছে বরফের পাহাড়, আবার কখনও একটানা শুষ্কপ্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার ফলে স্থলভাগকে একেবারে মরুভূমিতে পরিণত করে ছেড়েছে। অপরদিকে যখনই বড় রকমের দুর্যোগ নেমেছে তখনই পৃথিবীর পূর্ব পরিবেশটার আমূল পরিবর্তন এসেছে। তাই সেদিনের বাসিন্দাদের অধিকাংশকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হয়েছে। যারা কোন প্রকারে টিকে গেছে তাদের পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে

খাপ খাওয়াতে কঠোরভাবে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে এবং ঘন ঘন বসতিরও পরিবর্তন করতে হয়েছে। উক্ত কারণে তাদের পরবর্তী বংশধারার মধ্যে সূচিত হয়েছে নানা পরিবর্তন।

তিমি ও ডলফিনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। জল থেকে একদিন তারা ডাঙায় উঠে এসেছিল এবং কিছুকাল হয়ত স্বস্তিতে কাল কাটিয়েছিল। তারপর পরিবেশের পরিবর্তনের জন্যই হোক অথবা খাদ্যের ঘাটতির জন্য হোক অথবা অন্য কোন কারণে জলে বাস করার সমূহ বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হওয়ার আগে পুনরায় ওরা নেমে গেছে জলে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ডাঙায় বাস করার ফলে ডাঙার প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যও কিছু লাভ করেছিল। বসতি ত্যাগ করে জলে পুনরায় নেমে যাওয়ায় উভয় বৈশিষ্ট্যই তাদের মধ্যে থেকে গেছে। সমুদ্রে বিবর্তনের চাহিদা খুব কম বলে উভয় বৈশিষ্ট্যই নিয়ে তারা আজও বিদ্যমান। তাই ওরাও আমাদের কাছে এক একটি বিস্ময়।

(১) **তিমি**—বর্তমান পৃথিবীর সমূহ জলচর ও স্থলচরদের মধ্যে একমাত্র তিমিই বৃহত্তম জীব। কেবলমাত্র স্থলভাগে যাদের বাস তাদের মধ্যে আফ্রিকার হাতিই সুবৃহৎ। তাদের এক একটির ওজন প্রায় ৬ টন। কিন্তু জলের বাসিন্দা এক একটি নীল তিমির ওজন কম করে ১২০ টন। উচ্চতায় এক একটি একতলা বাড়ীর সমান উঁচু। কথিত আছে, একটি নীল তিমির শুধু দেহের চর্বি থেকে তেল পাওয়া যায় ৬ টনের মত অর্থাৎ স্থলভাগের এক একটি হাতির ওজনের সমান। নীল তিমিদের চেহারাটাও তেমনি। লম্বায় ১০০ থেকে ১২০ ফুটের কম হয় না।

তিমিরা সিতাসিঙ্গ বর্গের প্রাণী। এদের কয়েকটি উপবর্গ আছে। উপবর্গগুলির মধ্যে মিস্‌তোসেতি, ওদন্তোসেতি ও ওরসিনস প্রধান। সাধারণত মিস্‌তোসেতি উপবর্গের তিমিরাই সবচেয়ে বড়। নীল তিমিরা ঐ জাতের। যেহেতু গায়ের রঙটা শেওলার মত নীল, তাই অনুরূপ নামকরণ।

ওদন্তোসেতি তিমিরা মাঝারি আকারের এবং ওরসিনসরা ছোট জাতের তিমি। বেশীর ভাগ তিমির গায়ের রঙ ধূসর, কালো অথবা নীল। তবে সাদাটে রঙের তিমিও আছে। বড় জাতের তিমিরা আবার ছোটদের খেয়ে ফেলে। ওদিক থেকে মাছের সঙ্গে তিমিদের কিছুটা মিল আছে। এবং ঐ কারণেই মনে হয় তিমিঙ্গিলের কল্পনা। তিমিঙ্গিল বলতে যারা তিমিকেও গিলে খেতে পারে তাদের বোঝায়। যা চেহারা মিস্‌তোসেতিদের, তাতে তাদের তিমিঙ্গিল বলতে একটুও দ্বিধা আসে না।

নারওয়াল নামে আর এক জাতের তিমি আছে। এরা অপরাপর তিমিদের

থেকে বেশ স্বতন্ত্র। আকারে খুব বেশী বড় হয় না এবং মুখে থাকে বর্শার ফলকের মত একটা জিনিস। ঐ বর্শা দিয়ে তারা শত্রুকে ঘায়েল করতে ওস্তাদ।

তিমিরা শক্তিমানও বটে। ওদের সম্বন্ধে বহু গল্পও প্রচলিত আছে। শোনা যায়, কোন কোন তিমি এক একটা নৌকাকেও আটকে দিতে পারে।

যেহেতু পৃথিবীর সমূহ মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্বপুরুষ হচ্ছে মাছ এবং ঐ মাছ থেকে উভচর ও পরে স্থলচরদের আবির্ভাব, তাই তিমিরাও এককালে ছিল জলের বাসিন্দা। তারপর একদিন উঠে এসেছিল ডাঙায়। কয়েক হাজার পুরুষ ডাঙায় অতিবাহিতও করেছিল। ফলে, জলে বাস করার কিছু ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল এবং দেহস্থিত যন্ত্রেরও পরিবর্তন হয়েছিল। যেমন ফুলকো লুপ্ত হয়েছিল, সামনের পাখনা দুটি পরিবর্তিত হতে হতে পায়ের আকার প্রাপ্ত হয়েছিল এবং পেছনের পাখনা-দুটোর বিশেষ পরিবর্তন না হলেও পাখনার হাড়গুলো শরীরের মাংসের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। মাথার উপর নাসারন্ধ্রেরও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। মাছের মত কেবল ঘ্রাণ নিতে পারতো না, স্থলে আসার পর শ্বাসকার্যও চালাতে পারতো। জলে বাস করার অন্যান্য ক্ষমতা কিন্তু তখনও অটুট ছিল।

যে কোন কারণেই হোক একদিন ডাঙার বাস তাদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। হয়ত ডাঙায় একটানা উষ্ণপ্রবাহ প্রবাহিত হতে থাকলে স্থলভাগের জীবজন্তু ও গাছপালা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং বিশাল এই জানোয়ারদের খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখন পুনরায় খাদ্যের কারণে নামতে হয় জলে।

তিমিরা দেখতে ভারি কদাকার। ঘাড় নেই কারও। দেহের এক তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে কেবল মাথাটাই। যেমন বিরাট তাদের মাথা তেমনই মুখগহ্বর। ঠোঁটদুটো ভয়ানক পুরু। মিস্‌তোসেতিদের মুখের ভেতরে তালু থেকে ঝুলে থাকে অতি অদ্ভুত ও বিশ্রী ধরনের এক প্রত্যঙ্গ। তাতে সজ্জিত থাকে প্রায় দুশ' থেকে তিনশ'টি দাঁত। সেই দাঁতগুলো আবার আকারে নিতান্ত ছোট নয়। এক একটি লম্বায় প্রায় সাত ফুটের মত হয়ে থাকে।

তিমিদের শরীর লোমহীন। ডাঙায় উঠে আসার পর মনে হয় হাজার হাজার পুরুষের ব্যবধানে গায়ের কোথাও কোথাও অল্প-স্বল্প লোম গজিয়েছিল। সেগুলি পুনরায় লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু মুখের কাছে টিকে আছে মাত্র কয়েক গাছা।

জলে নেমে যাওয়ার পর কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে ওদের বংশধারার মধ্যেও যৎসামান্য পরিবর্তন এসেছে। বিশেষতঃ সামনের পা দুটি রূপান্তরিত হয়েছে প্যাডেলের আকারে। তবে স্থলচরদের অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখনও বজায় রেখেছে। যেমন ফুলকো নেই, বেশীক্ষণ জলে ডুবে থাকতে পারে না, সরাসরি

বাতাসকে নিয়ে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়, ইত্যাদি। প্রায় আধ ঘণ্টায় মধ্যেই মুখ উপরে তুলতে হয় শ্বাস গ্রহণের জন্য।

অপরদিকে তিমিদের মাছ বলা হলেও প্রকৃত মাছ এরা নয়। ওরা ডিম্ব উৎপাদনকারী নয়, পুরোপুরি স্তন্যপায়ী। আর স্তন্যপায়ীদের মতই তিমিদের দেহে উষ্ণরক্ত প্রবাহিত। মাছের মত শীতলরক্ত ওদের নয়। নিজের আকৃতি-বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে এবং সেই সন্তান মায়ের স্তন্য পান করেই বেঁচে থাকে।

তিমিদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, তারা ফোয়ারার আকারে উপরে জল তোলে। সুবৃহৎ শরীরটাকে নিয়ে বিশেষ ঘোরাফেরা করতে পারে না। সাগরতলায় কোন একটি জায়গা বেছে নিয়ে বেশ কিছুকাল তারা ঐখানে কাটিয়ে দেয়। ফুলকো না থাকায় শ্বাস গ্রহণের জন্য উপরে মাথা তুললে প্রথমে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। প্রকাণ্ড এই জানোয়ারটির নাসারন্ধ্র থেকে যখন প্রবলবেগে শ্বাস বেরিয়ে আসে তখন বেরিয়ে আসে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে প্রচুর জলীয় বাষ্প। সেই জলীয় বাষ্প উপরে ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে বিন্দু বিন্দু জলে পরিণত হয় এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই মনে হয়, সাগরবুকে যেন একটা ফোয়ারা উঠেছে। ভারি চমৎকার সে দৃশ্য!

তিমিরা রাক্ষুসে প্রাণী। ছোট ছোট মাছ, শামুক, গুগলি ইত্যাদি তিমিদের প্রধান খাদ্য। কোন কোন তিমি সমুদ্রের উপর বিচরণরত পাখীদেরও ধরে ধরে খায়। শরীরের তুলনায় গলনালী বেজায় ছোট হওয়ায় ওরা বড় বড় সামুদ্রিক প্রাণীকে গলাধঃকরণ করতে পারে না। তাই ছোট ছোট প্রাণীদের উপরেই নির্ভর করতে হয় এদের।

তিমিদের গায়ের চামড়া ভয়ানক মোটা। চামড়ার তলায় থাকে চর্বির পুরু আস্তরণ। ঐ চর্বি, মাথাভর্তি তেল, মুখে হাড়ের ঝালর এবং পেটের একরকম সুগন্ধি পদার্থ, ইত্যাদির লোভে মানুষ তিমি শিকার করে। যেহেতু শ্বাস গ্রহণের জন্য তিমিদের ঘন ঘন জলের উপর মাথা তুলতে হয় এবং যখনই মাথা তোলে তখনই ফোয়ারার আকারে উপরে জল উঠে, তাই তিমি শিকারীদের তিমি খুঁজতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। ফোয়ারা দেখলেই কাছে পিঠে শিকারীরা জাহাজ নোঙর করে। পুনরায় মাথা তুললেই হারপুন দিয়ে বিদ্ধ করে অথবা গুলি চালায়।

তিমিরা সমুদ্রের শীতল অঞ্চলের বাসিন্দা। তাই উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরেই ওদের দেখা যায়। তিমি শিকারীরা ঐ দুই মহাসাগরেই ভিড় করে এবং প্রতি বছর বহু তিমিকে হত্যা করে। এখন এমন সব জাহাজ তৈরি হয়েছে যে, তিমি শিকারের পর সেই জাহাজেই তিমির দেহ থেকে তেল, সুগন্ধি ইত্যাদি নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা থাকে। ব্যাপক হত্যার ফলে তিমির বংশ ধীরে ধীরে কমে যেতে বসেছে।

তিমিদের সম্বন্ধে বহু গালগল্প প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে ওরা নাকি জাহাজকেও আটকে দিতে পারতো। যেহেতু সেকালে পালতোলা জাহাজেই মানুষ সমুদ্রে যাতায়াত করতো এবং সেসব জাহাজের আকারও তত বড় ছিল না, তাই তিমিদের পক্ষে তেমন জাহাজ আটকানো এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার ছিল না।

সবচেয়ে রোমাঞ্চকর তথ্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে নীল তিমিদের সম্বন্ধে। যৌবনে নীল তিমিরা তাদের জীবনের সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী নির্বাচন করে নেয়। তারা পরস্পর পরস্পরকে এমন ভালবাসে যে কখনও একজন আর একজনের কাছ ছাড়া হয় না। কোন কারণে দুজনের একজন যদি মরে যায় তাহলে অপরে অবশিষ্ট জীবনটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। দ্বিতীয় সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী গ্রহণ করে না। স্ত্রী নীল তিমিরা নাকি আবার কঠোর বৈধব্য-জীবন যাপন করে। মূক জীবজগতে এ ধরনের ঘটনা সত্যিই একটি বিস্ময়।

(২) **ডলফিন**—তিমিদের মত ডলফিনরাও একদিন জল থেকে ডাঙায় উঠে বসতি স্থাপন করেছিল এবং স্থলভাগের পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে জলে বাস করার সমূহ দৈহিক বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হওয়ার আগে পুনরায় নেমে গেছে জলে। এরা আকৃতিতে অনেকটা মাছের মতই। তিমিদের মত ডলফিনরা সমুদ্রের একই জায়গায় পড়ে না থেকে এন্তার সাঁতার কেটে বেড়ায়। বড় চঞ্চল ও বড় আমুদে এরা। তবে মাছ ওরা নয়।

তিমিদের সঙ্গে ওদের বেশ কিছুটা মিল আছে। ওদের দেহেও উষ্ণরক্ত প্রবাহিত হয়, চামড়ার নিচে থাকে পুরু চর্বির আস্তরণ, মাঝে মাঝে জলের উপর মুখ তুলে বাতাস গ্রহণ করে এবং ফুসফুসে পাঠায়, ডিম না পেড়ে সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে এবং বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করে বড় হয়। অপরদিকে ডলফিনরাও তিমিদের মত সিতাসিঙ্গ বর্গের প্রাণী।

তবে আচার-আচরণে এবং নানা বৈশিষ্ট্যে এদের এক আশ্চর্যজনক জীব বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, মনুষ্যেতর যত জীব পৃথিবীতে আছে তাদের মধ্যে ডলফিনরাই অসাধারণ বুদ্ধি ধরতে পারে। মাথায় ওদের মগজের পরিমাণটা অপরাপর জন্তুজানোয়ার অপেক্ষা অনেক বেশী। ঐ কারণেই ওরা এত বুদ্ধিমান।

একটি আশ্চর্যের কথা, ডলফিনরা মানুষদের বড্ড বেশী ভালবাসে। তাদের সেই অকৃত্রিম ভালবাসার কথা গল্পের মত শোনায়। সেই সুদূর অতীতে যে সব দেশ সমুদ্রযাত্রা করতো তারা প্রত্যেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছে ডলফিনদের। গ্রীকরা আবার এদের সম্বন্ধে নানা গল্পও লিখে গেছেন।

প্রাচীন গ্রীস ছিল পণ্ডিতদের দেশ। সেখানকার পণ্ডিতেরা কেবলমাত্র নিজের দেশ থেকে বিদ্যাচর্চা করতেন না, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য এবং বাণিজ্যের কারণে দূর-দূরান্তে গমন করতেন। যেহেতু বিদেশ যাত্রায় একমাত্র জলপথই ছিল প্রশস্ত ও নিরাপদ এবং জল যানই ছিল দ্রুতগামী, তাই পণ্ডিতেরা ভালভাবে লক্ষ্য করতেন ডলফিনদের গতিবিধি ও আচরণ। তাঁরা উল্লেখ করে গেছেন, সমুদ্রে মানুষের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে ডলফিনরা। কোন সময়ে কোন জাহাজ পথভুলে বিপথে চালিত হলেই একক অথবা দলবদ্ধভাবে ছুটে আসে ডলফিনরা। তারপর জাহাজের সামনে থেকে তর তর করে এগিয়ে গিয়ে জাহাজকে সঠিক পথের সন্ধান দেয় এবং জাহাজ বিপন্মুক্ত হলেই তারা স্বস্থানে গমন করে।

প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী অ্যারিস্তোতল ডলফিনদের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। তিনি বলেছেন, ডলফিনরা হচ্ছে অতি পবিত্র এক জীব।

ডলফিনদের সম্বন্ধে সেকালে আরও বহুজনে বহুকথা লিখে গেছেন। প্রখ্যাত রোমক বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও প্রথম বিশ্বকোষ প্রণেতা প্লিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, ডলফিনরা মানুষের উপকারের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসে। ওদের পোষ মানাবার প্রয়োজন হয় না। তিনি একটি কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটি নিম্নরূপ :

এক হ্রদে বাস করতো ডলফিনরা। একটি বালক প্রত্যহ পায়ে হেঁটে হ্রদের অপর পারে এক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য যেতো। তাতে বালকটির ভয়ানক কষ্ট হতো। তাই দেখে একটি ডলফিনের ভারি কষ্ট হলো। একদিন করলো কি! সকালে বালকটি যখন স্কুলে যাওয়ার জন্য হ্রদের তীরে উপস্থিত হলো তখনই ডলফিনটি জলের উপর মুখ তুলে এক রকম শব্দ করে বালকটির মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলো। বালকটিও কৌতূহল বশতঃ ছুটে গেল ডলফিনটির কাছে। আর ডলফিনটি এক সময় সুযোগ বুঝে বালকটিকে পিঠে তুলে নিল। তারপর তর তর করে ছুটে গেল অপরপারে। সেখানে বালকটিকে নিরাপদে নামিয়ে দিয়ে ডুব দিল জলে। সেই থেকে ডলফিনটি দৈনিক বালকটিকে ছেড়ে দিয়ে আসতো এবং স্কুল ছুটি হলে পুনরায় নিয়ে আসতো এপারে।

প্লিনির কাহিনীটি সত্য কিনা জানা যায় না। তবে প্রখ্যাত গ্রীকবীর অডিসিয়ুসের পুত্র টেলিম্যাকাসের কাহিনীকে অনেকে সত্য বলে মনে করেন। টেলিম্যাকাস বাল্যাবস্থায় একদিন নৌকাযোগে সাগর অতিক্রম করছিলেন। কোন কারণে নৌকাটি মাঝসমুদ্রে গিয়ে একেবারে উপুড় হয়ে পড়লো। টেলিম্যাকাস সহ সমস্ত আরোহী নিমজ্জিত হলো জলে। ঠিক সেই সময় কোথা

থেকে একটি ডলফিন ছুটে এসে টেলিম্যাকাসকে পিঠে তুলে নেয় এবং তাকে নির্বিঘ্নে নামিয়ে দেয় সাগরতীরে বেলাভূমিতে। কথিত আছে, সেই থেকে ডলফিনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে টেলিম্যাকাস তাঁর বর্মে একটি ডলফিনের ছবি এঁটে রাখতেন। এবং আজীবন তিনি তাই করে গেছেন।

ডলফিনদের সম্বন্ধে আরও কত যে বিচিত্র কাহিনী আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কাহিনীগুলির সত্যতা যাচাইর জন্য একালে বহু পরীক্ষাও করা হয়েছে। অ্যাকোয়ারিয়ামে রেখে সহজে পোষ মানানোও হয়েছে ডলফিনদের। দেখা গেছে, অতি অল্পেই ওরা মানুষের বশীভূত হয়ে পড়ে। বল খেলে, অঙ্ক কষে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। ওদের গলার স্বরটাও বেশ মিষ্টি। ঐ কারণে যখন ওরা নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু করে দেয় তখন দূর থেকে গানের মত মনে হয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে ওরা এক প্রকার গলার স্বর প্রকাশ করে। সেই স্বর শ্রুতি সুখকর। তাই ওদের সেই শব্দকে বলা হয় ডলফিনের গান।

ডলফিনরা অযাচিতভাবে মানুষের যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে—এটি বর্তমানেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। কুক স্টেট থেকে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত সমুদ্রপথটি খুবই বিপজ্জনক পথ। এই অঞ্চলে প্রচুর ডুবো পাহাড় আছে। ১৮৮৮ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত যখনই কোন জাহাজ উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করতো তখনই ছুটে আসত একটি ডলফিন। সে জাহাজের সামনে ভেসে থেকে জাহাজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো। তারপর জাহাজ বিপন্মুক্ত হলেই ফিরে আসতো সে। ডলফিন না এলে জাহাজ ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে নিমজ্জিত হতো। নাবিকরা ওই ডলফিনটির নাম রেখেছিলেন পোলোরাম জ্যাক। পরে এমনও হয়েছিল, যতক্ষণ পোলোরামকে না দেখছে ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজ নোঙর করতে থাকতো। দীর্ঘ ২৪ বছর কাল সে বহু জাহাজকে পথ দেখিয়েছে। ১৯১২ সালের পর তাকে আর দেখা যায় নি। মনে হয় ঐ সময়ে সে মারা গেছে।

অতএব ডলফিনরা যে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়, অযাচিতভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে বা মানুষ বিপদে পড়লে বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ প্রতিদানের কোন অপেক্ষা রাখে না। এমন উচ্চমন তাদের!

ডলফিনরা মানুষের সঙ্গ যে খুব পছন্দ করে তার প্রমাণ কিন্তু পাওয়া গেছে। আমেরিকার জীব বিজ্ঞানীরা সমুদ্র থেকে ডলফিনদের এনে অ্যাকোরিয়ামে পুরে অনেক পরীক্ষা চালিয়েছেন। কোন অ্যাকোরিয়ামে যদি মাত্র একটি ডলফিনকে রাখা যায় তাহলে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়ে এবং অল্পদিনে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু

মানুষ যদি তাকে সঙ্গ দান করে তাহলে দিব্যি খোশ মেজাজে কাটিয়ে এবং বাঁচেও দীর্ঘকাল। মানুষের কাছে থাকতে, মানুষের সঙ্গে খেলাধুলা করতে, মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ওদের ভারি পছন্দ। ডলফিনদের অ্যাকোরিয়ামের কাছে ছেলেমেয়েরা গিয়ে হৈ হল্লা করলে ওরাও যে উল্লসিত হয়ে উঠে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের আচার আচরণে।

ডলফিনরা ভয়ানক ফূর্তিবাজ এবং আড্ডাবাজও। সমুদ্রে যেখানেই থাকে সেখানে দলবেঁধেই অবস্থান করে। আমরা মানুষরা যেমন নিঃসঙ্গ আদৌ-পছন্দ করিনা, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটু আড্ডা দিতে ভালবাসি, গান-বাজনার মাধ্যমে মনটাকে চাঙা করে নি, ওরাও ঠিক তেমনটি। এরা দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়, ফূর্তি করে এবং গান গায়। প্রাণীরাজ্যে তাই ডলফিনদের চেয়ে বড় বিস্ময় আর কেউ নেই।

শিকার ধরার সময় ওরা মুখ দিয়ে একরকম শব্দ করে। সেই শব্দ দূরে কোথাও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে তাকে গ্রহণ করার সামর্থ্য রাখে এবং প্রতিফলকের দূরত্ব কতখানি তাও সঠিকভাবে নির্ণয় করে নেয়। ঐ আশ্চর্য ক্ষমতাটির জন্য তারা সমুদ্রে নিমজ্জিত ডুবো পাহাড়; মাছের ঝাঁকের উপস্থিতি ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয় করতে আদৌ বেগ পেতে হয় না। আর ঐ কারণেই কোন কোন দেশ সমুদ্রে মৎস্য শিকারের জন্য ডলফিনদের প্রতিপালন করে।

শব্দ প্রেরণ এবং সেই শব্দের প্রতিধ্বনিকে গ্রহণ করার ক্ষমতা অবশ্য তিমিদেরও আছে। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও যেহেতু তিমিদের সঙ্গে ডলফিনদের মিল দেখা যায়, তাই ডলফিনকে তিমির বংশধর বলা হয়। এরা যখন ডাঙায় ঘুরে বেড়াতো তখন তাদের চারটে করে পা ছিল। লেজও ছিল হয়তো। জলে বাস করায় ফলে ওই লেজটা পুচ্ছপাখনায় পরিণত হয়েছে। পেছনের পাদুটি কবে লুপ্ত হয়ে গেছে এবং সামনের দুটি পা পরিণত হয়েছে পাখনায়। সেই পাখনাগুলিতে এখনও পাঁচ-পাঁচটা আঙ্গুলের চিহ্ন বর্তমান। তিমিদের মত ডলফিনদেরও মুখে দাঁত থাকে।

ডলফিনদের দৃষ্টিশক্তি তীব্র নয় এবং ঘ্রাণশক্তি একেবারে নেই বলা চলে। দুটি কান মাথার ভেতরেই ঢুকে আছে। ঐ কানের সাহায্যেই তারা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর চাহিদা পূরণ করে। তাদের মুখ দিয়ে যে শব্দ নির্গত হয় তা সচরাচর অন্য কোন প্রাণীদের কানে ধরা পড়েনা। অথচ সেই শব্দ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে তাদের অত্যন্ত সংবেদনশীল অন্তঃকর্ণে ধরা পড়ে। তাতেই তারা খাদ্য, শত্রু ইত্যাদির উপস্থিতি সহজেই টের পায়।

ডলফিনরা আকারে নিতান্ত ছোট নয়। সাধারণ ডলফিনরা দ থেকে আড়াই

মিটার পর্যন্ত লম্বায় হয়। তবে কোন কোন জাতের ডলফিনকে চার মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে। এতবড় শরীরটাকে নিয়ে তারা দিব্যি গভীর জলে ছোটাছুটি করতে পারে। গতিবেগও নিতান্ত কম নয়। ঘণ্টায় প্রায় ৩৫ কিলোমিটারের মত। গভীর জলের চাপকে এড়িয়ে এমন দ্রুতগতি-সম্পন্ন হওয়ার পেছনে কাজ করে তাদের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য। তাদের চামড়ার তলায় চর্বির পুরু আস্তরণটি এবং রক্তবহা নালীগুলির বিশেষ ভূমিকা গভীর জলের চাপকে উপেক্ষা করতে সাহায্য করে। অন্যান্য জলচর অপেক্ষা ওদের রক্তবহা নালীগুলির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রয়োজন হলে রক্ত নালীগুলির দু-দিকেই প্রবাহিত হতে পারে। তবে এমন বৈশিষ্ট্য স্থলচর জীবের অনেকের মধ্যে দেখা যায়।

ডলফিনরা নানা জাতের। এক জাতের ডলফিনকে আমরা শুশুক বলে থাকি। অথচ বুদ্ধিমান ডলফিনদের সঙ্গে শুশুকের প্রভেদ অনেকখানি। শুশুকরা আদৌ বুদ্ধিমান নয়, নদীতে থাকে এবং মুখটা চ্যাপ্টা ধরনের। কলিকাতার কাছে গঙ্গার বুকে ওদের মাঝে মাঝে জল তুলতে দেখা যায়। অথচ যে সব ডলফিনের সম্বন্ধে মজার মজার কাহিনী প্রচলিত তাদের মুখটা হাঁসের ঠোঁটের মত এবং বৈজ্ঞানিক নাম ডলফিনাস ডেলফিস।

পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠির ডলফিন বাস করে। সব গোষ্ঠীর গায়ের রঙ ও দৈর্ঘ্য সমান নয়। কারও গায়ের রঙ কালো, কারও ধূসর এবং কারও বা নীলচে। তবে পেটের তলদেশটার রঙ সবার সাদা। সমুদ্র ছাড়া কোন কোন বড় নদীতেও ওরা বাস করে।

ডলফিনরা একই সময়ে মাত্র একটি সন্তান প্রসব করে। প্রসূতি যখন সন্তানের জন্ম দান করে তখন মানুষের ঘরের মত পাশাপাশি স্ত্রী ডলফিনরা ছুটে আসে এবং প্রসূতি ও সন্তান উভয়ের পরিচর্যা করে। শিশুর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে তারা কলরবও করে যেন উলু দিয়ে মঙ্গলাচরণ করে। তারপর তাদের একজন সদ্যোজাত শিশুটিকে নিয়ে ছুটে যায় তীরের দিকে। শিশুটির শ্বাস গ্রহণের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য মাসী ডলফিনটি তীরের কাছে অল্প জলে শিশুটিকে তুলে ধরে জলের উপরে। অতঃপর শিশুটির শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে ফিরে এসে মায়ের কোলে অর্পণ করে। কয়েকদিন ধরে প্রসূতি এবং তার শিশুর পরিচর্যাও করে সবাই মিলে। বড় আশ্চর্য তাদের সেই আচরণ—একেবারে যেন আমাদের মানব সমাজের কথা।

ডলফিনরা প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ বছর বাঁচে। ওদের খাদ্য সমুদ্রের মাছ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ওরা দল বেঁধে ঘুরে এবং আহারের অন্বেষণ করে।

ডলফিনরা মানুষকে এত ভালোবাসলেও মানুষ তাদের ভালবাসার মর্যাদা দেয়

না। তাদের চর্বি ও পাখনার লোভে এন্তার হত্যা করে চলেছে। যেহেতু এরা মাছের লোভে মাছের ঝাঁকের পাশাপাশি ঘুরে বেড়ায় তাই জেলেদের জালে ধরা পড়ে অনেকে। দামী পাখনা ও চর্বির জন্য শিকারও করা হয়। তাই এদেরও বংশ তিমিদের মত ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে বেশী ডলফিন শিকার করা হতো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উপ-কূলবর্তী অঞ্চলে। বহু শিকারী সব সময় ঘুরে বেড়াতো এবং হত্যা করতো লক্ষ লক্ষ ডলফিন। কিছুকাল আগে উভয় দেশের সরকার ডলফিন শিকার নিষিদ্ধ করেছে। তবে গোপনে গোপনে কিছু কিছু হত্যাকাণ্ড অব্যাহত আছে এখনও। হায়রে ডলফিন! এত ভালবেসেও সে মানুষের করুণা লাভ করতে পারলো না! কি নির্মম আর কি স্বার্থান্ধ এই মানুষের মন!

(৩) **মৎস্যকন্যা বা ডুগং ও ম্যানাটি**—"মৎস্যকন্যা"—নামটির মধ্যেই যেন একটা রোমাঞ্চের গন্ধ আছে। প্রাচীনকালে সমুদ্রে যারা বেশী ঘোরাঘুরি করতেন—সেই সব পর্তুগীজ ও স্পেনীয় নাবিকরা এদের নামকরণ করেছিলেন "স্ত্রী মাছ"। কারণ, ওদের দেহের উর্ধ্বাংশটা অনেকখানি একজন স্ত্রীলোকের মত দেখতে। বিখ্যাত নাবিক কলম্বসও দেখেছিলেন ওদের তিনটিকে। তিনি উল্লেখ করেছেন, জলচর এই প্রাণীরা আদৌ সুন্দরী নয়। বুকে ও মুখে একটুখানি মানুষের মেয়ের সাদৃশ্য আছে। ঐ একটি কারণে জীবটি মানুষের কাছে এত বিস্ময়!

ভারত মহাসাগরে দৈবাৎ এক একটি মৎস্যকন্যাকে দেখা যায়। তাই পূর্ব উপকূলের অধিবাসীদের মধ্যে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। লৌকিক কাহিনী, পুরাণ-উপপুরাণ, এমনকি বহু বিদেশী সাহিত্য থেকেও মৎস্যকন্যা সম্বন্ধীয় বহু রোমাঞ্চকর তথ্য লাভ করা যায়। কিংবদন্তীর সেই মৎস্যকন্যা যার কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, মাথায় একঢাল কালোচুল, কমনীয় মুখ, পরীর মত ডানা, অথচ কোমর থেকে নিচের দিকে একেবারে মাছের মত। ওরা জোৎস্নারাতে সমুদ্রের নির্জন উপকূলে উঠে আসে এবং খেলা করে। প্রাচীন ও আধুনিক বহু সাহিত্যিক আবার মানুষের প্রতি এদের ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে দারুণ রোমাঞ্চকর সব গল্পও ফেঁদেছেন।

কিংবদন্তীর সেই মৎস্যকন্যাদের সঙ্গে বাস্তবের বড় একটা মিল নেই। তবে একেবারে যে কাল্পনিক—তা বলা ঠিক হবে না। মনে হয়, গল্প রচয়িতাদের কেউ কেউ হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন এবং কাহিনী রচনা করতে গিয়ে বাস্তবের সঙ্গে কিছু রঙীন কল্পনা যোগ করে এক একটি উপাদেয় কাহিনী উপহার দিয়েছেন। নাবিক-দের কাছ থেকে যতটুকু খবর পাওয়া গেছে তা হলো, দিনের বেলায় ওদের দেখা

যায় না। রাতে জলের উপর মাথা তুলে দূরের পানে তাকিয়ে থাকে। অথচ সামান্য শব্দ পেলেই চকিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে জ্যোৎস্নারাতে ওদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় ভালভাবেই।

কদাচিৎ জেলেদের জালেও আটকায় কেউ কেউ। জেলেরা দেখেছেন, কোমর থেকে উপরের দিকে নিরাবরণা নারীদেহের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আরও আশ্চর্য, ওরা যখন সন্তানকে স্তন্য দান করে তখন ঠিক মানুষের মায়ের মত বুকে জাপটে ধরে। আর সামনের দুপাশের পাখনা দুটির এমনই গড়ন যে, দূর থেকে হাত বলেই ভ্রম হয়। অন্যদিকে ওদের চিৎকার ও চেঁচামেচিটাও অনেকটা মানুষের মত। গায়ে ওদের আঁশও নেই। মুখটা চ্যাপ্টা ধরনের এবং লোমহীন শরীর। রঙটা রাজকন্যার মত দুধে আলতা না হলেও এদের সম্বন্ধে নানা কল্প-কাহিনী যে গড়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি আছে!

পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলে কদাচিৎ কোন কোন জেলের জালে এক একটি উঠে। তাই জেলেদের মধ্যে নানা মুখরোচক কাহিনীও গড়ে উঠেছে। সে সব কাহিনীর সত্যতা আদৌ নেই। ওরা জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং নিশাচরও। তিমি বা ডলফিনদের মত ওরা একদিন জল থেকে উঠে এসে ডাঙায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। পরে প্রতিকূল পরিবেশে থাপ খাওয়াতে না পেরে পুনরায় জলে নেমে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ থেকে অন্তত: পাঁচ কোটি বছর আগে। তিমি-ডলফিনের মত লোমহীন প্রাণী, শরীরে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত এবং চামড়ার তলায় পুরু চর্বির আস্তরণ থাকে।

ওদের বেশীর ভাগকে দেখা যায় ভারত মহাসাগরে, ক্যারাবিয়ান উপসাগরে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এবং অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উপকূলবর্তী অঞ্চলে। ভারত মহাসাগরে যাদের বাস তাদের বলা হয় ডুগং এবং অন্যত্র যাদের দেখা যায় তাদের নাম ম্যানাটি। ডুগং অপেক্ষা ম্যানাটিরা আকারে ছোট। অপরদিকে স্ত্রী ম্যানাটি অপেক্ষা স্ত্রী ডুগংদের নিরাবরণা নারীদেহের সঙ্গে সাদৃশ্য অধিক।

ডুগংদের মাথাটা চ্যাপ্টা ধরনের। মুখের 'হাঁ'টা শরীরের তুলনায় বেশ ছোটই বলতে হবে। ঠোঁট দুটোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। উপরের ঠোঁটটা এত পুরু ও মোটা যে, বেশ কিছুটা নিচের দিকে ঝুলে তলার ঠোঁটটাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। নিচের ঠোঁটের অস্তিত্ব বাহির থেকে ধরা যায় না। ঠোঁটের অনুরূপ আকারের জন্য ডুগংদের সমুদ্রগাভীও বলা হয়।

ডুগং বা ম্যানাটি কারুরই পা নেই। মাথা ও ধড়ের একটা ক্ষীণ সংযোগ ধরা পড়ে তবে ঠিক গলা বলা যায় না। বুকের দুপাশ থেকে দুটি লম্বা ও সুন্দর পাখনা

গজিয়েছে। যখন ওরা স্থলচর ছিল তখন ওদের চারটে পা অবশ্যই ছিল। কোটি কোটি বছর জলে অতিবাহিত করার ফলে পায়ের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় পেছনের পা দুটি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে এবং সামনের পা দুটি জলে সন্তরণের উপযোগী লম্বা লম্বা প্যাডেলে পরিণত হয়েছে। এগুলি আদৌ মাছের পাখনার মত নয়। ব্যবহারও করে বড় অদ্ভুত ভাবে। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে স্তন্য দান করে, ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে মুখেও পুরে, আবার সাঁতারও কাটে। ওরা নিরামিষাশী। সামুদ্রিক আগাছা ও শৈবাল ওদের প্রিয় খাদ্য। এদের গ্রহণের রীতিটি কিন্তু মানুষের মত।

ডুগং বা ম্যানাটি—সবারই চামড়া ভয়ানক পুরু। চামড়ার তলায় চর্বির আস্তরণ দেহের তাপ সংরক্ষণের সাহায্য করে। বুক ও পেটের মাঝখানে মধ্যচ্ছদা আছে। মধ্যচ্ছদাটি অত্যন্ত মাংসল এবং তির্যকভাবে বসানো। ডুগংরা লম্বায় চার থেকে পাঁচ মিটার এবং ওজনে এক টনের কাছাকাছি। ম্যানাটিরা এত বড় নয়।

দেহটা বিশাল হলে কি হবে ভয়ানক ভীতু এরা সবাই। জলের খুব গভীরে এদের বাস নয় এবং ডাঙা ওদের ভারী পছন্দ। গভীর রাত্রিতে তারা নির্জন সাগর সৈকতে বালিতে নাক গুঁজে পড়ে থাকে অথবা জ্যোৎস্নারাতে জলের উপরে মাথা তুলে এদিকে ওদিকে তাকায়। কিন্তু সামান্য একটু শব্দেই তারা সচকিত হয়ে উঠে এবং মুহূর্তে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

পুরুষ ডুগং বা ম্যানাটিরা অন্য ধরনের। স্ত্রী ডুগংদের সঙ্গে নারী দেহের অল্প একটু সাদৃশ্য থাকলেও পুরুষরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ওদের মুখের দুপাশে বেশ বড় বড় দুটি দাঁত থাকে। ওদের স্ত্রী আর পুরুষ রূপকথার রাক্ষস আর রাজকন্যা যেন।

অতি প্রাচীনকালেই ওদের অস্তিত্ব মানুষের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সেদিন এদের পরিচয় কেউ উদ্ঘাটন করতে পারে নি। তাই সমুদ্র তীরবর্তী কোন কোন অঞ্চলে জলদেবী ভেবে পূজো দেওয়া হতো। দু-একটা বছর আগেও জলের উপর দাঁড়িয়ে স্ত্রী ডুগং বা ম্যানাটিদের পাখা নাড়তে দেখলে নাবিকেরা মনে করতেন স্বয়ং জলদেবী তাঁদের আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন। আর ঐ কারণেই আগে ওদের বলা হতো "বিশপ ফিস।"

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন সাগর ও মহাসাগরে ডুগং ও ম্যানাটিদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আদি উভচর স্তন্যপায়ী থেকে ওদের উৎপত্তি হয়েছিল। কালক্রমে বহু প্রজাতিতে বিভক্তও হয়ে পড়ে। ওরা জলে নেমে গেলেও ওদের কোন প্রজাতি ডাঙা ত্যাগ করেনি। সেই সব প্রজাতির কোন একটি শাখা বিবর্ত-

নের নানা স্তর অতিক্রম করার পর হাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। অথচ ডুগং ও ম্যানাটিরা জলে নেমে যাওয়ার পর পরিবেশের গুণে সামান্য কয়েকটি পরিবর্তন ছাড়া আর পরিবর্তন আসেনি। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, এরা সাইনেরিয়া নামক উভচরদের শেষ বংশধর। ঐ সাইনেরিয়াদের জীবাশ্ম কিন্তু অনেক পাওয়া গেছে হাতের কাছে।

দুঃখের বিষয়, ঐ ডুগং বা ম্যানাটিদের নিয়ে খুব বেশী গবেষণা আজও হয়নি। মার্কিন জীববিজ্ঞানী ও. ব্যারেটই সর্বপ্রথম আফ্রিকার মোজাম্বিকের উপকূলে জেলেদের জালে আবদ্ধ একটি ম্যানাটিকে লাভ করে কিছুকাল গবেষণা চালিয়েছিলেন। ওদের চিড়িয়াখানায়ও রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ওরা এককভাবে বেশীদিন বাঁচে না বা ডলফিনদের মত মানুষের সান্নিধ্যও পছন্দ করেনা। যতদিন বাঁচে ততদিন কেবল চোখের জল-ফেলেই কাটায়। খাওয়া-দাওয়া সব-কিছুই পরিত্যাগ করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চোখের জল ফেলাটা আরও দু-একটি সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। তাদের মধ্যে সমুদ্র-কচ্ছপ অন্যতম। ধরা পড়লে টুপটাপ জল ফেলে। কাটতে উদ্যত হলে তো কথাই নেই। অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে।

(৪) **সীল, ওয়ালরাস ইত্যাদি**—সীল, ওয়ালরাস বা সিন্ধু-ঘোটক, সিন্ধু সিংহ, সিন্ধু হস্তী প্রভৃতি আরও কতকগুলি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীর নাম করা যেতে পারে—যারা একদিন স্থলেরই বাসিন্দা ছিল। বসতির গোলমালের জন্য বাধ্য হয়ে তিমি, ডলফিন প্রভৃতির মত পুনরায় জলে নেমে গেছে। তবে বেশীর ভাগ সময় সমুদ্রে পড়ে থাকলেও এরা প্রত্যেকেই উভচর। তিমি কিংবা ডলফিনদের মত পুরোপুরি জলের বাসিন্দা নয় বা শ্বাস গ্রহণের জন্য উপরে মাথা তুলে পুনরায় ডুব দিতে হয় না।

এদের সবারই আছে চারটে করে পা। এককালে পাগুলো বেশ শক্তসমর্থই ছিল। জলে বাস করার ফলে বিবর্তন হতে হতে লম্বা লম্বা পাখনায় পরিণত হয়েছে। পাখনাগুলো যেমন চওড়া তেমনই মাংসল। অপরদিকে ওরা সবাই মেরু অঞ্চলের বাসিন্দা।

এরা উভচর হলেও ডাঙায় ভালভাবে হাঁটতে পারে না। যেহেতু পাগুলোর আকার পাখনার মত, তাই যখন ডাঙায় হাঁটতে যায় তখন পাখনাগুলোকে মাটিতে টেনে হেঁচড়ে একরকম থেৎলে থেৎলে চলে। হাঁটার এই অসুবিধার জন্যই মনে হয় ডাঙাতে বেশী থাকে না। তবে বাচ্চা দেওয়ার সময় জল থেকে ডাঙায় উঠতে বাধ্য হয়। নিজের আকৃতি-বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে এবং সন্তান মাতৃস্তনা পান করে বেঁচে থাকে।

সবার মধ্যে সীলদের অবস্থা এখন চরমে। সীলের সুস্বাদু মাংস ও চর্বির লোভে মানুষ ওদের যথেচ্ছভাবে হত্যা করে চলেছে। এক জাতের নরম লোমওয়ালা সীল আরও লোভনীয়। প্রধানত চামড়ার লোভে প্রচুর পরিমাণে তাদের হত্যা করা হয়। যেহেতু মেরুদেশের বাসিন্দা এরা, তাই গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বরফ গলতে শুরু করলেই উত্তর-মেরু সাগরে হাজার হাজার শিকারী সেখানে ভিড় করে। সীল এস্কিমোদের প্রধান খাদ্যও। গ্রীষ্মকালে ওরা বাচ্চা প্রসব করে।

ওয়ালরাস বা সিন্ধু-ঘোটকরা (সি-হর্স এরা নয়। সি-হর্স আকারে নিতান্ত ছোট এবং পুরোপুরি জলের বাসিন্দা। মুখটাই কেবল ঘোড়ার মত। দীর্ঘ লেজটাকে সাগর তলায় আগাছার সঙ্গে আটকে রেখে শিকারের অপেক্ষা করে। এরা আবার ডিম্ব প্রসবী) সীলদের স্বগোত্র। কিন্তু আকারে বেশ বড়। পূর্ণবয়স্ক এক একটি ওয়ালরাসের ওজন প্রায় এক টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের মাথা শরীরের অনুপাতে অনেক ছোট। অথচ উপরের চোয়াল থেকে দুটি বড় বড় দাঁত বেরিয়ে এসে নিচের দিকে ঝুলে থাকে। দাঁত দুটির এক একটি লম্বায় এক থেকে দেড় ফুট।

ওয়ালরাসদের মত আর দুটি জীবকে উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরে দেখা যায়। তাদের একটিকে বলে সিন্ধু সিংহ এবং অপরটি সিন্ধু হস্তী নামে পরিচিত। চেহারায় সবাই ওয়ালরাসদের মত। তবে দাঁত নেই। তাছাড়া স্থলভাগের সিংহ কিংবা হস্তীর মত চেহারাও নয় এদের। সবার সেই পাখনাওয়ালা পা, ডাঙায় চলতে কষ্ট, দেহে পুরু চর্বির আস্তরণ। থাকার মধ্যে সিন্ধু সিংহদের ঘাড়ে কয়েকগাছা লোম ও সিন্ধু হস্তীদের মুখে সামান্য একটু শুঁড়ের মত থাকে। এরা ওয়ালরাসদের একেবারে জাত ভাই।

কয়েকটি আজব প্রাণী

(১) **উট**—উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। মাথায় দ্বাদশ সূর্যের রশ্মি, তলায় ধসধসে উত্তপ্ত বালুকারাশি, মাঝে মাঝে তীব্র বালির ঝড় প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন এমন কি মাসের পর মাস একটানা পথচলা সত্ত্বেও যে জীবটি আদৌ ক্লান্তি বোধ করেনা—সে উট। এদের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, মাত্র একবার জল পান করে কয়েক মাস কাটিয়ে দিতে পারে। তাই মরুভূমির জলহীন পরিবেশে একমাত্র উটই হচ্ছে মানুষের বাহক। উটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তাদের পিঠের কুঁজ। ঐ কুঁজ দেখে উটকে দুটি প্রজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

এক-কুঁজ বিশিষ্ট ও দু-কুঁজ বিশিষ্ট। এক-কুঁজ বিশিষ্ট উটকে আমরা সচরাচর দেখতে পাই। দু-কুঁজ বিশিষ্ট উট বেশ বিরল।

শুধু জল নয়, কোনকিছু আহার না করেও উটরা অনেকদিন কাটিয়ে দিতে পারে। এমন বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর খুব কম জীবের মধ্যে দেখা যায়। সাপ, ব্যাঙ, লাঙফিস প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী পর্যাপ্ত আহারের ফলে যেমন দেহে চর্বি জমিয়ে ফেলে এবং শীতঘুমের সময় ঐ চর্বি তাদের জোগায় জীবন রক্ষার উপাদান তেমনই উটের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। তবে উট শীতঘুম দেয় না। একটানা কিছুকাল আহারের পর ওদের কুঁজে চর্বি জমার ফলে কুঁজটা স্ফীত হয়ে উঠে। আর তখনই উট মরুভূমির উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী হয়। এই অবস্থায় কম খাদ্য অথবা খেতে না দিলেও কোন অসুবিধা বোধ করে না। কুঁজের চর্বিই দৈহিক সমস্ত কাজকর্মকে অটুট রাখতে সক্ষম হয়।

উটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকাল জলপান থেকে বিরত থাকা এবং দেহে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা। আগে মনে করা হতো উট তাঁর কুঁজের ভেতরে জল রাখে। এটি কিন্তু ঠিক কথা নয়। পাকস্থলীতেও জল পুরে রাখেনা বা দেহের অন্য কোথাও জল ধরে রাখার ব্যবস্থাও নেই। তবু ওদের সবসময় প্রয়োজন হয় না জলপানের।

মরুভূমিতে জল দুষ্প্রাপ্য বলে সেখানকার স্থায়ী বসবাসকারী জীবদের দেহত্বকে নানা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। দেহের জল যাতে বর্জ্য পদার্থ তথা মল, মূত্র, ঘাম ইত্যাদির মাধ্যমে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্য তাদের দেহের এবং দেহত্বকের বৈশিষ্ট্যই আলাদা। তেমনই উটের দেহত্বকেরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ওরা পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়লে কিংবা কমলে যাতে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত না হয় তার জন্য ইচ্ছে করে দৈহিক তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। অবশ্য অত্যন্ত গরমে বা শীতে ছাড়া অন্যসময় অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। দেখা গেছে, গরমের সময় দৈহিক তাপমাত্রাকে ১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট বাড়িয়ে ফেলতে পারে। আমরা মানুষরা যা কল্পনায়ও স্থান দিতে পারি না। স্বাভাবিক তাপমাত্রার উপরে মাত্র কয়েক ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ বাড়লেই বেহুঁস হয়ে পড়ি। উটের দেহত্বকের এই বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য প্রচণ্ড গরমেও তাদের দেহের জলীয় অংশ ঘামের আকারে বেরিয়ে যেতে পারে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না।

উট সহজলভ্য অবস্থায়ও ঘন ঘন জলপান করে না। এটিও আমাদের কাছে একটি তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হয়। কেননা জীবমাত্রেরই দেহের উপাদানের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী থাকে জল। ঠিকমত জলপান না করলে কিংবা অন্য কোন কারণে দেহের জলীয় অংশের ঘাটতি ঘটলে রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যু

ঘটাতে পারে। বিশেষজ্ঞদের হিসাবে দেহের মোট জলের যদি মাত্র এক চতুর্থাংশের মত ঘাটতি ঘটে যায় তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখনই রক্তের জলীয় অংশের হ্রাস পাওয়ায় আয়তন দাঁড়াবে দুই-তৃতীয়াংশ। আর রক্ত এই অবস্থায় জমাট বেঁধে যাবে। কিন্তু উটের দেহের এমনই বৈশিষ্ট্য, দেহের জলীয় অংশকে এক চতুর্থাংশের মত খরচ করলেও রক্তের আয়তন অতি সামান্য হ্রাস পায়। শুধু কি তাই? শরীরের জলীয় অংশের অর্ধাংশের মতও যদি খরচ হয়ে যায় তাহলেও তাদের রক্ত জমাট বাঁধে না এবং মৃত্যুও হয় না।

ক্রমাগত কয়েকমাস ধরে জলপান না করলে উটের দেহ অনেকখানি শীর্ণ হয়ে পড়ে। তবে আশ্চর্য এই যে, জলপানের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই সে তার পূর্বের শরীর ফিরে পায়। দেখা গেছে, দীর্ঘকাল উট জলপানে বিরত থাকলে একবারে ১০০ লিটারের মত জল দেহে চালান করে দিতে পারে।

উটের পায়ের তলাটা চ্যাপ্টা ও পুরু। ঐ কারণে মরুভূমির বালির উপর দিয়ে চলতে তাদের কোন কষ্ট হয় না। ওদের নাকে ও কানে থাকে বিশেষ পর্দা। চামড়ার একটা পাতলা পর্দা মুখের উপরও ঝুলে থাকে। চোখের পাতায় থাকে বড় বড় লোম। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার জন্য মরুভূমির উপর বালির ঝড় উঠলে ওদের চোখে, কানে, নাকে ও মুখে বালি ঢুকতে পারেনা। উটের অতি সংবেদনশীল স্নায়ু থাকার জন্য মরুভূমির বুকে ঝড় ওঠার আগেই টের পায় আর তখনই বালির মধ্যে মুখটা গুঁজে দেয়। আরোহীরা উটের ক্রিয়াকলাপ দেখে বুঝে নেয় অবিলম্বেই ঝড় উঠবে এবং তখনই সাবধান হয়ে পড়ে।

উটরা সাধারণত নিরীহ জীব। কিন্তু রেগে গেলে মহা বিপত্তি ঘটায়। ওরা একটু স্বাধীনতা প্রিয়ও। তবে গোঁয়ার নয়। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে লাথি মারে, থুথু ছিটায়, এমন কি তেড়ে এসে কামড়ও দিতে চায়। ওরা দ্রুতগামীও বটে। পিঠে আড়াই কুইণ্ট্যালের মত বোঝা নিয়ে ঘণ্টায় ৪৫ কিলোমিটার বেগেও পথ হাঁটতে পারে। উট গৃহপালিত জীব। মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের বাসিন্দারা দুধ, মাংস ও যাতায়াতের জন্য উটকে প্রতিপালন করে।

(২) **লামা**—লামা পৃথিবীর বিরল প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। ওদের দেখা যায় কেবলমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পর্বতমালা অঞ্চলে। স্বভাবে উটের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও চেহারায় আদৌ মিল নেই। উট যেমন মরুভূমির একমাত্র বাহন তেমনিই আণ্ডিজ পর্বতমালার বাহন লামারা।

লামারা উচ্চতায় মাত্র তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। শরীরের অনুপাতে মাথাটা ছোট এবং পাগুলো বেশ লম্বা। ছোট লেজ, সুন্দর দুটি চোখ, লম্বা কান এবং পায়ের তলায় থাকে মাংসের গদি। পায়ে আবার সুতীক্ষ্ণ নখরও

আছে। লামাদের লম্বা পা এবং পায়ের তলায় মাংসল অংশের জন্য পাহাড়ে আরোহণ করতে কোন অসুবিধা হয় না।

লামারা আকারে ছোট হলে কি হবে ভারবহনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোগ্রামের মত বোঝা অনায়াসেই তারা বহন করতে পারে। তবে গতি তাদের বড় মন্থর। সারাদিনে বড়জোর দশ মাইলের মত পথ হাঁটে।

পশুদের মধ্যে সবচেয়ে গোঁয়ার প্রাণী মনে হয় ঐ লামারা। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। জোর করে অথবা মারধোর করে ওদের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় না। এমনকি পথে যেতে যেতে একটু বিগড়ে গেলেও মালিককে নাজেহাল করে ছাড়ে। এরা আবার একা কোথাও যেতে চায় না। দল বেঁধেই পথ চলবে, খাবে এবং বিশ্রাম করবে। পিঠে একটু বেশী মাল চাপাবারও উপায় নেই। যদি বোঝা ভারি হয় তাহলে চুপচাপ শুয়ে থাকবে। মেরে ফেললেও উঠবে না।

লামাদের আত্মরক্ষার উপায়টি ভারি মজার এবং ঐ কারণেই ওকে এক অদ্ভুত জীব বলে ধরা হয়। শত্রুকে সামনে পেলে অথবা কেউ তাকে চটালে সঙ্গে সঙ্গে থুথু ছিটিয়ে দেয়। সে থুথু উটের মত সাধারণ থুথু নয়। তার সঙ্গে থাকে উগ্‌রে আনা অর্ধেক হজম-হওয়া খাবার। সেগুলি এত দুর্গন্ধ যে, মানুষ তো দূরের কথা কাছে পিঠে কোন জন্তু-জানোয়ারও থাকতে পারে না। আর ঐ কারণেই যারা লামাদের পালন করে তারা তাদের চটাতে সাহস করে না। বরং ভালোয় ভালোয়, ভুলিয়ে-ভালিয়ে কাজ আদায় করতে চেষ্টা করে।

ভার বহনের ক্ষেত্রে পুরুষ-লামাদেরই ব্যবহার করা হয়। স্ত্রী-লামারা ভার বহন করে না। ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায় দুধ ও অতি উন্নত মানের পশম। লামারা কুড়ি বছরের বেশী প্রায়ই বাঁচে না।

(৩) **কাঙ্গারু র‍্যাট**—মরু অঞ্চলের এমন কিছু কিছু বাসিন্দা আছে—যারা দীর্ঘকাল জলপান না করে বেঁচে থাকতে পারে। তবে কালেভদ্রে বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টির জল আকণ্ঠ পান করে নেয়। মরুভূমির জীবমাত্রই জল সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং মিতব্যয়ীও। সবারই দেহত্বক দেহের জল সংরক্ষণের উপযোগী। কিন্তু জলপানের আদৌ প্রবণতা নেই—এমন জীব অত্যন্ত বিরল এবং বিরল প্রাণীটি মনে হয় কাঙ্গারু র‍্যাট।

আকারে ধেড়ে ইঁদুরের মত দেখতে কাঙ্গারু র‍্যাটরা মেক্সিকোর মরুভূমির বাসিন্দা। এরা গর্তে বাস করে। অস্ট্রেলিয়ার আজব প্রাণী কাঙ্গারুদের সঙ্গে ওদের আদৌ মিল নেই। বরং ইঁদুরের সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। মার্সুপিয়াল

বর্গের অন্তর্গত প্রাণীও এরা নয়। কেবলমাত্র কাঙ্গারুদের মত পেছনের দু-পা এবং লেজের উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। তাই অনুরূপ নামকরণ।

কাঙ্গারু র‍্যাটরা নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলায় গর্তের ভেতরে লুকিয়ে থাকে এবং রাত হলে বেরিয়ে খাবারের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। ইঁদুরের মত এরা গর্তে খাদ্য সঞ্চয় করেও রাখে।

কাঙ্গারু র‍্যাটদের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য জলপান থেকে সারাজীবন বিরত থাকার কারণ নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। জানা গেছে, ওরা জীবনধারণের উপযোগী জল খাদ্য থেকেই সংগ্রহ করে নেয়। ঐ জল সংগ্রহের মূলেও আছে এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। আমরা জানি, প্রাণীদের খাদ্য মাত্রই এক একটি জৈব যৌগ এবং যৌগটিতে হাইড্রোজেন অবশ্যই বিদ্যমান। কাঙ্গারু র‍্যাটরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করে তাতে যৌগিক হিসাবে যে হাইড্রোজেন থাকে তার জারণ ঘটে এবং এই জারণের ফলে যতটুকু জল উৎপন্ন হয় তাতেই তাদের জলপানের প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হয়।

অপরদিকে ওদের শরীর থেকে জলীয় অংশও নির্গত হওয়ার উপায় নেই। স্বেদগ্রন্থি না থাকায় ঘর্ম নির্গত হতে পারে না। মল-মূত্রের মাধ্যমে যে জলীয় অংশ নির্গত হয় তাও যৎসামান্য বলা যেতে পারে। ওদের মূত্র অত্যন্ত গাঢ় এবং মল অতিশয় শক্ত। ঘন ঘন মলমূত্র ত্যাগও করে না এরা। আবার প্রতিটি জীবকে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কিছু জলীয় বাষ্পকে পরিত্যাগ করতে হয়। কিন্তু কাঙ্গারু র‍্যাটদের নিঃশ্বাসে একটুও জলীয় বাষ্প বহির্গত হয় না। অর্থাৎ যতটুকু জল ওরা খাদ্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তাকে সংরক্ষণ করার একেবারে কড়া ব্যবস্থা রেখেছে শরীরে। বেরিয়ে যাওয়ার এতটুকু ফাঁক-ফোকর কোথাও নেই।

কাঙ্গারু র‍্যাটদের শ্রবণশক্তিও বড় বিস্ময়কর। অতি সামান্য শব্দ—যা আমাদের কিংবা অধিকাংশ জন্তু-জানোয়ারদের কানে ধরা পড়ে না—তা এদের কর্ণগোচর হয়। তাই তাদের যথেষ্ট শত্রু থাকা সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করতে কোন অসুবিধা হয় না। ওদের প্রধান শত্রু পেঁচা ও র‍্যাটেল সাপ। এরা উভয়েই নিশাচর। আর নিশাচর কাঙ্গারু র‍্যাটরা। খাদ্য অন্বেষণরত অবস্থায় আকাশে পেঁচার ডানা নাড়ার অতি ক্ষীণ শব্দেও সচকিত হয়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই "একবুদ্ধি বেড়ালের" মত গর্তের দিকে ছুটে পালায়। অপরদিকে র‍্যাটেল সাপরাও অতি নিঃশব্দে শিকারের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাদের একটি বৈশিষ্ট্য, যখনই শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় তখনই ঝুমঝুম করে একটি ক্ষীণ শব্দ নির্গত হয়। সেই শব্দ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই কাঙ্গারু র‍্যাটরা চোখের পলকে লাফ দিয়ে ওঠে এবং দ্রুত আত্মগোপন করে।

(৪) জিরাফ—বর্তমান জীব জগতে একমাত্র জিরাফই উচ্চতম প্রাণী। গলাটা অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হওয়ার জন্যই এত উচ্চ ওরা। এমন এক একটি জিরাফ দেখা যায়—যারা একতলা সমান উঁচু বাড়ীর ছাদ পর্যন্ত মাথাটা তুলে দিতে পারে। কিম্বা পাঁচ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট গাছের পাতা ছিঁড়ে খেতে পারে। তাই বলে চেহারাটা এমন কিছু বিশাল নয়। শুধু পাগুলো এবং গলাটাই লম্বা। সেই তুলনায় লম্বা লেজও আছে।

জিরাফের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই কারণে জীবজগতে ওকে একটু স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। প্রথমত গলাটা এত লম্বা হলে কি হবে মাথাটা ছোট। ঘাড়ে হাড়ের সংখ্যা অন্যান্য অনেক জীবের মত মাত্র সাতখানা। কিন্তু সেগুলি বেজায় লম্বা। তাই ঘাড়টা এত উঁচু।

জিরাফের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তাদের হৃৎপিণ্ডখানা। এত বড় হৃৎপিণ্ড অপর-কোন প্রাণীর নেই। কাছাকাছি দু ফুটের মত লম্বা। অপরদিকে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও বড় ভয়ানক। মানুষের প্রতি মিনিটে যেখানে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০, গরুর যেখানে ৭০, হাতির ২৫, বাঘ সিংহের ৪০, সেখানে জিরাফের ১৫০।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, ওরা শিং নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। অথচ শিং এমন কিছু বড় হয় না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, ওদের জিভ। জিভটা লম্বায় পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটারের মত। এত লম্বা হওয়া সত্ত্বেও জিভটা সরু কিংবা লিকলিকে নয়। অপরাপর দশটা সাধারণ প্রাণীর জিভের গড়নের মতই এদের জিভের গড়ন।

জিরাফকে সাধারণত বোবা জীব বলে মনে করা হয়। আসলে কিন্তু বোবা নয় এরা। অন্যান্য জীবের তুলনায় এদের ভোকাল কর্ডটা অত্যন্ত অপরিণত হওয়ায় ওদের গলার স্বর শোনা যায় না। কালেভদ্রে অল্প একটু গলার ডাক শোনা যায় মাত্র।

জিরাফরা তৃণভোজী এবং গরু-ছাগলের মত জাবরও কাটে। অপরদিকে অন্যান্য তৃণভোজীদের মত পাকস্থলীও চার প্রকোষ্ঠযুক্ত। বড় দ্রুতগামী এরা। ঘণ্টায় অক্লেশে পঞ্চাশ কিলোমিটারের মত বেগ নিয়ে দৌড়াতে পারে। ওরা যখন দৌড়ায় তখন ভারি সুন্দর দেখায় ওদের। পাগুলো দ্রুত তালে পড়তে থাকে আর ঘাড়টা উপর-নিচ হতে থাকে। এমন সুন্দর দৌড়ানোর দৃশ্য অপর কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমায়, শোওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না।

আফ্রিকার অরণ্যে জিরাফদের দেখা যায় এবং বহু চিড়িয়াখানায়ও রাখা হয়েছে এদের।

(৫) শ্লথ—যারা ভারি কুঁড়ে তাদের আমরা গোঁফ খেজুরে, কুঁড়ের বাদশা ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করে থাকি। কিন্তু শ্লথের কুঁড়েমির কাছে কোন তুলনাই খাটে না। সত্যি এক আশ্চর্য জীব ঐ শ্লথরা।

শ্লথদের দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকার ঘন অরণ্যের মধ্যে। পৃথিবীর অপর কোথাও এদের দেখা পাওয়া যায় না। বৃক্ষবাসী এই জীবটি এত অলস ও এত মন্থর যে, কোন একটি গাছের একটি মাত্র শাখাকে অবলম্বন করে সারা জীবনটা কাটিয়ে দেয়। মাটিতে নামার প্রয়োজন হয় না কোনদিনই।

শ্লথরা লোমশ প্রাণী। চারটে পা। পায়ের শেষ প্রান্তে দুটি কিংবা তিনটি লম্বা লম্বা আঙ্গুল থাকে। ঐ আঙ্গুলের সাহায্যে গাছের শাখাকে ধরে ঝুলতে থাকে। শাখায় বসে বিশ্রাম করা কিংবা ঘুরে বেড়ানোর আদৌ প্রয়োজন হয় না। কোন কারণে শাখান্তরে গমন করতে হলেও ঝুলতে ঝুলতে অগ্রসর হয়। ওতে তাদের আঙ্গুলে ব্যথাও হয় না বা মাটিতে খসেও পড়ে না। মুখের কাছে খাবার এলে তবেই খায়। না হয় পায়ের ফাঁকে মুখটা রেখে চুপচাপ ঝুলে থাকে।

শ্লথরা স্তন্যপায়ী হলেও অপরাপর স্তন্যপায়ীদের মত এত উন্নত নয়। কারণ ওদের দেহের তাপমাত্রা সবসময় সুনির্দিষ্ট থাকে না। পরিবেশের তাপমাত্রার তারতম্য অনুযায়ী এদের দেহের তাপমাত্রাও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তবে বাহিরের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত হলে দেহ আর তাপমাত্রার সমতা রাখতে সক্ষম হয় না। তখনই মারা যায়। আরও মজার কথা, গরম সহ্য করতে না পেরে মারা যাবে তবু একটু ঠাণ্ডা জায়গার অনুসন্ধান করে না।

একই জায়গায় ঝুলে থাকার দরুন শ্লথদের গায়ে যথেষ্ট শেওলা জমে উঠে। তাই তাদের দেহ থেকে একটু সবুজ আভা নির্গত হয়। কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি পড়ে থাকলে বর্ষার সময় যেমন সবুজ হয়ে যায় কিংবা পাকা ইটের দেওয়ালে যেমন শেওলা জমে, এদের দেহেও তেমনিই জমে উঠে। জড় পদার্থের মত এত নিশ্চল এরা! অবশ্য ওদের দেহের শেওলা সাফ করার ব্যবস্থা প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দিয়েছে। শেওলা ভক্ষণের আশায় জড় হয় এঁটুলি জাতীয় কীট, মথ প্রভৃতি। তাই যেখানে শ্লথ থাকে সেখানে শেওলা ভক্ষণকারীরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

শ্লথরা একই ডালে সন্তান প্রসব করে এবং সন্তানকে স্তন্যদান করে। বাচ্চা বড় হলে দূরে কোন ডালে ঝুলতে থাকে অথবা বৃক্ষান্তরে গমন করে সারা জীবনকালটা কাটাবার মত একটি শাখাকে পছন্দ করে নেয়। ওদের ঐ কুঁড়েমি ও মন্থরতার জন্য আমরা দীর্ঘসূত্রীদের শ্লথ নামে অভিহিত করি। আসলে যে যতই মন্থর হোক না কেন শ্লথের মত কেউ নয়।

(৬) **আর্থ পিগ**—আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের বাসিন্দা আর্থ পিগ আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই কারণে যে, এদের মত এমন তীব্র ঘ্রাণশক্তি এবং শ্রবণশক্তি পৃথিবীর অন্য কোন জীবের মধ্যে দেখা যায় না। আকারে এক একটি শূকর ছানার মত এবং গর্তে বাস করে। তাই অনুরূপ নামকরণ। ওদের ইংরাজীতে আর্ডভার্কও বলা হয়। ওদের মুখের দুপাশে গোঁফে যে লোমগুলি থাকে তাও তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন।

এরা নিজেদের সুতীক্ষ্ণ নখরদ্বারা নিজেরাই গর্ত খুঁড়তে পারে। ওদের গর্তগুলি মাটির তলায় গ্যালারির মত স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। আশ্চর্যের কথা, ওরা শত্রুর গন্ধ পেলে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি নতুন গর্ত খুঁড়ে তাতে আত্মগোপন করতে পারে।

(৭) **রেকুন**—আমরা মানুষেরা খাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করি। যখনই আমরা ফল-মূল ইত্যাদি খাই কিংবা মাছ, তরিতরকারিকে রান্না করতে যাই তখন ভালভাবে তাদের ধুয়ে নিই। অন্যদিকে খেতে বসলেও হাত-মুখটাকে পরিষ্কার করি। এমনটি কিন্তু ইতর জীবজন্তুরা করে না। তারা খাদ্য পাওয়া মাত্রই আহারে প্রবৃত্ত হয়।

কিন্তু একটিমাত্র প্রজাতির ছোট প্রাণী পাওয়া যায়, যে খাওয়ার ব্যাপারে মনে হয় মানুষের চেয়েও সতর্ক। আমরা অন্ততঃ রান্নাকরা খাদ্য বা অপর কিছু কিছু জিনিস জলে না ধুয়েও খেতে দ্বিধা বোধ করি না। কিন্তু ওরা ; যদিও রান্না-করা খাবার গ্রহণ করে না, তবু যা খায় তাকে ভালভাবে ধুয়ে তবেই আহারে মনসংযোগ করে।

প্রাণীটির নাম রেকুন। দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা ওরা। আকৃতিতে অনেকটা আমাদের দেশের বেড়ালদের মত। নিশাচর ও স্তন্যপায়ী। কিন্তু গায়ে অসাধারণ শক্তি। তাদের ঐ বিশেষ অভ্যাসটির জন্য বাস করে কোন-না-কোন জলাভূমির ধারে। এরা দলবদ্ধ জীব। দিনের বেলায় ঘুমায় এবং রাত্রি হলে দল বেঁধে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

রেকুনদের সর্বভুক বলা চলে। মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, পাখীর ডিম প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন গ্রহণ করে তেমনিই ফল, মূল, বাদাম, দানাশস্য প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্যও তাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। আর যাই খাক না কেন, আগে তারা জলাশয়ে এনে ধুয়ে নিয়ে তবেই খায়।

(৮) **বাদুড়**—পাখীদের মত বাদুড় আকাশে উড়তে পারলেও বাদুড় পাখী নয়। কারণ, একমাত্র আকাশে ওড়া ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বাদুড়ের নেই। প্রথমতঃ ওদের শক্ত চোয়াল আছে এবং সেই চোয়ালে দাঁত আছে, পাখীদের দাঁত

নেই। দ্বিতীয়তঃ বাদুড়দের বাচ্চা হয় এবং সেই বাচ্চা মায়ের দুধ পান করে বড় হয়, পাখীরা ডিম্ব প্রসবী। তৃতীয়তঃ বাদুড়দের ডানায় একটি পাতলা চামড়ার আস্তরণ থাকে মাত্র, পাখীদের ডানায় রঙবেরঙের পালক থাকে। চতুর্থতঃ বাদুড়দের গায়ে লোম থাকলেও পাখীদের পালকের মত নয় এবং এদের পায়ের নখগুলি বেশ ধারাল। নখগুলি অনেকটা আংটার মত। ঐ আংটার মত নখগুলি দিয়ে গাছের শাখাকে আঁকড়ে ধরে এবং মুখটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। এক শাখা থেকে অন্যশাখায় যেতে হলে ঝুলে ঝুলে যায়। পাখীদের মত গাছের ডালে সোজা হয়ে বসতে পারে না বা হাঁটতেও পারে না।

পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানে বাদুড়কে দেখা যায়। কিন্তু সব বাদুড় এক ধরণের নয়। খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বাদুড়দের বেশ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক শ্রেণীর বাদুড় কেবল ফলের রস খায়, এক শ্রেণী ফুল ও মধু খেয়ে জীবন ধারণ করে, এক শ্রেণীর বাদুড় কেবল কীটপতঙ্গ শিকার করে খায়, আর তিন শ্রেণীর বাদুড় জীবজন্তুর রক্ত শোষণ করে খায়। রক্তশোষক বাদুড়দের বলা হয় ভ্যাম্পায়ার বাদুড়।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এবং অধিক বর্ষণযুক্ত অঞ্চলে পৃথক পৃথক ধরণের বাদুড় বাস করে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে প্রায় আশি রকমের, অধিক বর্ষণযুক্ত অঞ্চলে পঁচাত্তর রকমের এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রায় দশ রকমের বাদুড় দেখা যায়। ওদের মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বাদুড়রাই অপেক্ষাকৃত ছোট। এরা ফলাহারী। ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করে পরিত্যক্ত ও ভাঙ্গা বাড়ী অথবা মন্দিরে। কোথাও বা দল বেঁধে গাছের ডালে ঝুলে থাকে। ওদের মুখ ছোট ও লোমশ, মুখের আকৃতি অনেকটা ইঁদুরের মত, গায়ের রঙ ধূসর অথবা লালচে।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বাদুড়রাই আকারে বড় হয়ে থাকে। ওদের কারও কারও পাখা জোড়ার বিস্তার পাঁচ ফুটের মত। সববেয়ে বড় জাতের নাম উড়ন্ত খেঁকশিয়াল। তবে ওরাও সবাই ফলাহারী।

বর্ষাঞ্চলের ঘন অরণ্যে যে সব বাদুড় দেখা যায় তাদের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর বাদুড় বেশ স্বতন্ত্র ধরণের। এরা কেউই ফলাহারী নয়। তবে অনেকে ফুল ও মধু খেয়ে জীবন ধারণ করে। সাধারণতঃ রাতে যে সব ফুল ফোটে তাদের রঙ সাদা অথচ গন্ধ থাকে। বাদুড় ঐ গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে যায়। এতে ফুলের পরাগ সংযোগও ঘটে থাকে। মালয়ের কোন কোন অরণ্যে এক জাতের ফুল মাঝরাতে ফোটে এবং ফোটার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঝরে পড়ে। তাদের বংশ বিস্তারের সহায়ক একমাত্র বাদুড়রাই।

বর্ষাঞ্চলের ঘন অরণ্যেই বাস করে রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ার বাদুড়রা। ওরা

ছোট ছোট পশুপাখীর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে। কয়েক জাতের ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কাছে আবার গরু, মহিষ প্রভৃতি বড় বড় প্রাণীরাও রক্ষা পায় না। তবে মেরে ফেলতে পারে না। কেবল তীক্ষ্ণ নখর নিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে রক্ত শুষে খায়। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় র‍্যাবিট নামে এক শ্রেণীর ভ্যাম্পায়ার বাদুড় ঘুমন্ত মানুষের রক্ত শোষণ করে। এর ফলে মানুষ যদিও মরে না তবে বহু জটিল রোগের সৃষ্টি করে।

বেশীর ভাগ মাংসাশী তথা ভ্যাম্পায়ার বাদুড় ছোট ছোট কীট পতঙ্গ থেকে ইঁদুরদের মত জীবকে ভক্ষণ করে। আমাজান নদীর তীরে জঙ্গলে যে সব বাদুড় বাস করে তারা নদী থেকে ছোট ছোট মাছ ধরে খায়। গাছের কোটরেই এদের বাসা।

পৃথিবীতে কত জাতের যে বাদুড় আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই কারণে বাদুড়কে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই বিজ্ঞানীদের। ওরা জীব জগতের মধ্যে বেশ একটু স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এই কারণে যে, নিশাচর হওয়া সত্বেও এরা রাতে খুব ভালভাবে দেখতে পায়না। অথচ দশ-বিশ মাইল দূরের খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি ওরা ভালভাবেই নির্ণয় করে নিতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিশক্তির কোন প্রয়োজন হয়না। মানুষের অত্যাধুনিক আবিষ্কার রাডার যন্ত্রের মতই যেন কাজ করে বাদুড়ের দেহ।

বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন, বাদুড় যখন উড়তে থাকে তখন মুখে এক ধরণের শব্দ করে। সেই শব্দ অপর কোন জীবের শ্রুতিগোচর হয় না। এক কথায় শব্দোত্তর তরঙ্গ সে উৎপাদন করতে পারে। ঐ তরঙ্গ প্রতিহত হয়ে ফিরে এলে বাদুড়ের অপেক্ষাকৃত বড় কান এবং দেহের সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন শিরার দ্বারা ধরা পড়ে। ফলে আপনা হতেই বাদুড় বুঝে নেয় কোথায় এবং কতদূরে কী জাতীয় জিনিস অবস্থান করছে।

বাদুড়ের ঐ বৈশিষ্ট্যটি সত্যিই বড় অদ্ভুত। ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্য ওরা সরু ফাঁদকেও এড়িয়ে চলতে পারে। এমন সূক্ষ্ম অনুভূতি ওদের।

(৯) **মাকড়সা**—মাকড়সা আমাদের অতি পরিচিত জীব। এখানে-ওখানে, ঘরের আনাচে-কানাচে মাকড়সাদের প্রায়ই চোখে পড়ে। অতি ক্ষুদ্র এক সাধারণ প্রাণী, তবু অজস্র বৈশিষ্ট্যে ভরা ওদের জীবন। বিজ্ঞানীদের চোখে এরা এক একটি মূর্তিমান বিস্ময়ও বটে।

মাকড়সারা সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী হলেও সাধারণ পোকামাকড় থেকে স্বতন্ত্র। ষটপদীও নয়। আটটে লম্বা লম্বা পা। প্রতিটি পায়ের ডগায় থাকে চিরুণীর দাঁড়ার মত শক্ত শক্ত রোঁয়া। এদের মাথায় চোখের সংখ্যাও আট। তবে

কোন কোন জাতের মাকড়সাদের চোখের সংখ্যা ছয় কিংবা চারও হয়ে থাকে। কিন্তু সবার চোখের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। আলো ও অন্ধকার উভয় অবস্থাতেই তারা ভালভাবে দেখতে পায়। অপরদিকে মাকড়সারা পোকা না হলেও পোকাদের মত মুখের দুপাশে অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন দুটি শুঁড় বা অ্যান্টেনা থাকে।

জীববিজ্ঞানীরা মাকড়সাদের অ্যারাকনিডি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ঐ শ্রেণীটির নামকরণের মূলে আছে একটি গ্রীক পুরাণ কাহিনী। অতি প্রাচীনকালে গ্রীসে অ্যারাকনী নামে একটি মেয়ে খুব ভাল তাঁত বুনতে পারতো। তার তৈরি সুতো এত সুক্ষ্ম ও কাপড় এত মিহি হতো যে, যারাই সে কাপড় দেখতো তারাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। ওতে অ্যারাকনীর হলো ভারি অহঙ্কার। সে বলে বেড়াতে লাগলো, কাপড় বোনায় সে বয়ন শিল্পের দেবী এথেনকেও পরাভূত করতে পারে। কথাটা একদিন এথেনের কানে যেতে এথেন ভয়ানকভাবে রেগে গিয়ে উপস্থিত হলেন অ্যারাকনীর সামনে। এবং আহ্বান জানালেন বস্ত্র বয়নের জন্য। অ্যারাকনী দ্বিরুক্তি না করে অসীম ধৈর্যসহকারে শুরু করলো কাপড় বুনতে। শেষে এমন এক মিহিকাপড় উপহার দিলেন যে, দেখে সবার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ওতে এথেন আরও রেগে গেলেন। তিনি কাপড়টিকে তক্ষুণি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। তখন ক্ষোভে ও দুঃখে গলায় দড়ি দিল অ্যারাকনী। কিন্তু এথেন তাকে প্রাণে মারলেন না। দৈবী মায়ায় অ্যারাকনী একটি ছোট্ট মাকড়সা হয়ে ঝুলতে লাগল। দেবী তখন, বললেন "তুমি এইভাবে চিরটা কাল শুধু বুনেই যাও।"

মাকড়সার জাল সত্যিই এক বিস্ময়। আর ঐ বিস্ময়কর জিনিসটিকে নিয়ে অনুরূপ কাহিনী গড়ে ওঠা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। ওদের সুতো অতি মিহি ও সিল্কের মত চকচকে। দেখলেই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। তবে দেখা গেছে, সব মাকড়সা জাল বোনে না। একাজে ওস্তাদ স্ত্রী মাকড়সারাই।

ছোট্ট এক মাকড়সা নিমেষে বিরাট এক জাল খাটিয়ে ফেলতে পারে। এখন প্রশ্ন আসবে, ওরা ঐ সুতো পায় কোথা থেকে ?

মাকড়সার পিছনে আছে সুতো তৈরির কারখানা। সেখানে একরকম তরল পদার্থ নিঃসরণের কতকগুলি গ্রন্থি আছে। গ্রন্থির সংখ্যা চার অথবা ছয়। প্রতিটি গ্রন্থির সঙ্গে আবার যুক্ত থাকে স্পিনারেট নামে ছোট্ট মুখওয়ালা যন্ত্র। ঐ যন্ত্রে থাকে কয়েকশ সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম নল। গ্রন্থিগুলি থেকে তরল নিঃসরণের পর সূক্ষ্ম নলের মাধ্যমে সেগুলি বেরিয়ে আসে এবং বাহিরের বায়ুর সংস্পর্শে এলেই শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। শক্ত হতে একটু সময় অবশ্য লাগে। আর ঐ কারণেই অপর সুতোর সঙ্গে সহজেই জোড়া লেগে যায়।

মাকড়সার সুতো বেশ চটচটে এবং এর উপাদান ফাইব্রাইন নামে একপ্রকার প্রোটিন। চটচটে ঐ জালে পোকামাকড় আটকে যায় এমন কি আমাদের হাতে মুখে লাগলেও আমরা অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু মাকড়সাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। তার কারণ, মাকড়সাদের পায়ে থাকে একরকমের পিচ্ছিল পদার্থ।

মেয়ে মাকড়সারা প্রধানত দুটি কারণে জাল পাতে। প্রথম ও প্রধান কারণ খাদ্য সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয় কারণ পুরুষ মাকড়সাকে আমন্ত্রণ জানানো। জালের একপাশে বা মাঝখানে পায়ে একগাছা সুতো নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। জালে পোকামাকড় পড়লেই সুতোয় টান ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে শিকারের উপর। ঐ সুতো, তীব্র ঘ্রাণশক্তি ও তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন গায়ের লোমগুলির দ্বারা তারা নির্ণয় করে নেয় কোথায় এবং কতদূরে শিকার আটকেছে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মাকড়সার গায়ের লোমগুলি যেকোন ধরণের শব্দ-তরঙ্গকে ধরতে পারে।

মাকড়সাদের খাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত। ওদের চোয়াল না থাকায় কোন কিছুকে চিবিয়ে খেতে পারে না। জালে যখন শিকার আটকায় তখন ছুটে গিয়ে শিকারকে জাপ্টে ধরে এবং হুল ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। শিকারটি বিষক্রিয়ায় মারা যাওয়ার পর পুনরায় একরকম হজমী রস ঢেলে দেয়। ঐ রসের এমনই বৈশিষ্ট্য যে, ওতে শিকারটির দেহে পচন ধরে না এবং দেহটাও অত্যন্ত নরম হয়ে উঠে। তখনই ধীরে-সুস্থে শিকারের দেহরস পান করে আর খোলসটাই কেবল পড়ে থাকে। অপরদিকে বোলতা প্রভৃতি বড় ও বিষাক্ত হুলযুক্ত পোকা জালে আটকালে ওরা সোজাসুজি তাদের জাপ্টে ধরে না। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে আঠালো সুতার দ্বারা প্রথমে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। পরে সুযোগ বুঝে ঘায়েল করে।

সব রকমের মাকড়সা জাল বুনতে পারে না। অ্যারিনস, অ্যারানিয়া, অ্যারিনাকো, অজেলিনা প্রভৃতি কয়েক জাতের মাকড়সাই জাল বুনতে ওস্তাদ। দক্ষিণ আমেরিকায় একজাতের মাকড়সা আবার সন্ধ্যায় জাল পেতে বাসায় ফিরে আসে এবং সকাল বেলায় জাল সমেত শিকারকে টেনে নিয়ে আসে। তারপর বাসার সবাই মিলে জাল ও শিকার দুটিকেই পরমানন্দে ভোজন করে। অস্ট্রেলিয়ায় একজাতের মাকড়সা পায়ে আঠালো জাল নিয়ে শূন্যে ঘোরাতে থাকে এবং উড়ন্ত পোকা মাকড়দের বন্দী করে। আর একজাতের মাকড়সা শিকারের উপর জাল ছুঁড়ে মারে। অ্যাডিকুলারিডী নামে একজাতের মাকড়সা আবার পাখীদের শিকার করে থাকে এবং তাদের দেহের রস পান করে থাকে।

লাইকোসিডি, সলটিসিডি, সাইটোডিস, থোমিসিডি প্রভৃতি গোত্রভুক্ত

মাকড়সারা জাল বুনতে পারে না। কিন্তু শিকার ধরাটা এদের আরও অদ্ভুত ধরণের। লাইকোসিডিদের দ্রুত দৌড়ানোর জন্য বলা হয় নেকড়ে মাকড়সা। শিকারের সন্ধান পেলে দ্রুত শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শিকারকে জাপ্টে ধরে। সলটিসিডিরা আড়ালে লুকিয়ে থেকে পিটপিট করে তাকায় আর শিকারকে নাগালের মধ্যে পেলে অতর্কিতে আক্রমণ করে। সাইটোডিসরা দৌড়ঝাঁপ করে না। শিকারকে নাগালের মধ্যে পেলে তার দিকে বিষাক্ত লালা ছুঁড়ে মারে। থোমিসিডিরা ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং নিজের গায়ের রঙকে পরিবর্তিত করে ফুলের সঙ্গে মিশে যেন একাকার হয়ে যায়। পোকামাকড় মধু খেতে এলেই ঘায়েল করে ফেলে। আর গিবোডেস জাতের মাকড়সারা আবার অপরের শিকার চুরি করে।

কিছু কিছু বড় মাকড়সা ছোট মাকড়সাদের ভক্ষণ করে। কোন কোন জাতের মাকড়সা আবার নিজের ডিমকেও খেয়ে থাকে। এমনও দেখা গেছে, খোলসের মধ্যে আবদ্ধ মাকড়সার বাচ্চারা পরস্পর পরস্পরকে খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

মেয়ে মাকড়সারা জাল পেতে নিজের জীবন সঙ্গীও নির্বাচন করে। জাল দেখে আকৃষ্ট হয় পুরুষ-মাকড়সারা। পছন্দ হলে জালে নাড়া দেয় আর স্ত্রী-মাকড়সা তখন তাকে ডেকে এনে সুখে ঘরসংসার পাতে। এটি হয়ে থাকে কেবল মাত্র অ্যাজেলিমা জাতের মাকড়সাদের ক্ষেত্রে।

অ্যারেনিয়া জাতের স্ত্রী-মাকড়সারা ভয়ানক দজ্জাল। পুরুষদের চেয়ে এরা আকারে বড় হয়। পুরুষ-মাকড়সা জালে টান দিলে ওরা ছুটে যায়। কিন্তু পেটে ক্ষিধে থাকলে তক্ষুণি তার ঘাড় মটকে ফেলে। যদি ভর পেট থাকে তাহলেই আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে! কোন সময় যদি শিকার না জোটে তাহলে ঐ পুরুষটার দ্বারাই জলযোগ সম্পন্ন করে নেয়।

নেকড়ে মাকড়সাদের স্ত্রী-পুরুষদের মধ্যে পূর্বরাগ দেখা যায়। পুরুষরা ঘর-সংসার পাতার আগে মেয়ে মাকড়সার মন জয় করার জন্য খাদ্য উপহার দেয়, জালে এসে নাচে ইত্যাদি। থোমিসিডি গোত্রের মাকড়সারা পৌরুষের জোরে বন্দী করে মেয়েদের। এমনকি সুতোতে বেঁধে মেয়ে মাকড়সাকে টানতে টানতে বাসায় নিয়ে আসে।

মাকড়সাদের সন্তান প্রতিপালনও ভারি মজার। এমন যে দজ্জাল অ্যারেনিয়া জাতের স্ত্রী-মাকড়সা, তারাও সন্তান প্রতিপালন করতে নিজের জীবনটাই বিসর্জন দেয়। ডিমগুলোকে প্রথমে খোলসে আবদ্ধ করে নিয়ে কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখে এবং নিজে অতন্দ্র প্রহরীর মত জেগে থাকে। খাওয়া দাওয়াও বন্ধ

করে দেয়। তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে বেরুতেই মা অনাহারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

অ্যাজেলিনা জাতের মাকড়সারা ডিম পাড়ার আগে কোন গোপন জায়গায় বাসা তৈরি করে এবং বাসাটা সুতো দিয়ে নরম গদির মত করে ফেলে। ডিম পাড়ার পর আহার নিদ্রা ত্যাগ করে চুপচাপ বাসায় পড়ে থাকে এবং সন্তানের মুখদর্শনের আগেই মৃত্যু বরণ করে।

নেকড়ে মাকড়সারা খোলসের মধ্যে ডিমকে পুরে সেই খোলসকে সব সময় বুকে জাপ্টে ধরে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে সেই বাচ্চাদের ঘাড়ে বহন করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বাচ্চাদের খাবার দেয় না। তাই শিকারের সামর্থ অর্জন না করা পর্যন্ত বাচ্চাদের উপোসে দিন কাটাতে হয়। কখনও কখনও বাচ্চারা আবার সুযোগ বুঝে একে অপরকে সংহার করে। তবে অন্য জাতের কিছু কিছু মাকড়সা বাচ্চাদের খাবারও দিয়ে থাকে।

মাকড়সাদের বিদঘুটে চেহারা, ইয়া লম্বা লম্বা ঠ্যাং, ড্যাবডেবে চোখ বিষাক্ত লালা আমাদের ভীতির সঞ্চার করে। কোন কোন মাকড়সা কামড়ায় এবং ওদের জাল নাকে মুখে লাগলে আমরা অস্বস্তি অনুভব করি। তথাপি এরা আমাদের কিছু উপকারও করে। আমাদের চারপাশে অজস্র ক্ষতিকর পোকামাকড় ও জীবাণুকে সংহার করে। ফলে অনেকখানি বিপন্মুক্ত হই আমরা।

(১০) প্যাঙ্গোলিন, আর্মাডিলো ও গণ্ডার—নিকৃষ্ট শ্রেণীর বহু-জীবের দেহে শক্ত আবরণ থাকে। শামুক, গুগলি, কচ্ছপ, গুবরে পোকা, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি বহু খোলসযুক্ত প্রাণী আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু উন্নত স্তন্যপায়ীদের গায়ে খোলস থাকে না। ব্যতিক্রম কেবল দুটি প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাদের একটির নাম প্যাঙ্গোলিন ও অপরটির নাম আর্মাডিলো। তবে গণ্ডারকেও এই পর্যায়ে আনা যেতে পারে।

প্যাঙ্গোলিনদের বেশীর ভাগ দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশে। দু-ফুটের মত লম্বা এই প্রাণীটিকে পিপীলিকাভুকও বলা হয়। দক্ষিণ ভারতে এদের একটি প্রজাতিকে পাওয়া যায়। এদের আমরা বলি বনরুই।

প্যাঙ্গোলিনদের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সর্বত্র বড় বড় শক্ত আঁশের মত জিনিস দিয়ে ঢাকা থাকে। আঁশগুলির অগ্রভাগ বেশ ধারালো। কিন্তু বুকের তলায় এ ধরনের আঁশ থাকে না। তাই শত্রুর সাড়া পেলে কেন্নো, গুবরে পোকা ইত্যাদির মত মুখটা পেটের তলায় গুঁজে দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে নেয়। আর আঁশগুলো ছুরির ফলার মত বাহিরে বারিয়ে থাকে। তখন শত্রু কিছুতেই তাকে ঘায়েল করতে পারে না।

প্যাঙ্গোলিনদের চেহরাটা কিন্তু ভাল নয়। মাথাটা নিতান্ত ছোট। মাথায় মস্তিষ্কের পরিমাণ কম হওয়ায় বুদ্ধি কম, তথাপি অত্মরক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতন। ওদের চারটে পা বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পায়ের তলায় সুতীক্ষ্ন নখর থাকায় গর্ত খুঁড়তে কোন অসুবিধা হয় না। ভয় পেলে পাগুলোকেও কুণ্ডলীর মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। হাঁটার সময় গুটি গুটি চলতে থাকে এবং নখগুলোকে থাবার ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়।

শরীরের তুলনায় প্যাঙ্গোলিনদের লেজটা বেশ বড়। একমাত্র ওদের লেজেই থাকে পঞ্চাশ খানা কশেরুকা। এমনটি অপর কোন স্তন্যপায়ীর মধ্যে দেখা যায় না।

আফ্রিকার অরণ্যের কিছু কিছু প্যাঙ্গোলিন বৃক্ষবাসীও। তারা লেজের ডগাটাকে গাছের ডালে জড়িয়ে রেখে সুখে বিশ্রাম করে।

প্রত্যেক জাতের প্যাঙ্গোলিনই পিপীলিকাভুক। ওদের সরু ও লম্বা জিভ থাকে। সেই জিভ বেশ আঠালো। পিঁপড়ে কিংবা উইর বাসায় তারা অবলীলাক্রমে তাদের সরু জিভটাকে চালিয়ে দেয়। পিঁপড়ে কিংবা উই শত্রু ভেবে দলে দলে চেপে বসে জিভের উপর আর সঙ্গে সঙ্গেই আটকে যায়। প্যাঙ্গোলিনরা তখন সুড়ুৎ করে জিভটাকে টেনে এনে মুখে পুড়ে দেয়। ওদের দাঁত না থাকায় চিবুতে পারে না। সরাসরি পাকস্থলীতে গিয়ে পেষক যন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়।

প্যাঙ্গোলিনদের স্বজাতি আর এক বর্মধারী জীবকে দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। নাম তাদের আর্মাডিলো। এদের দেহে শক্ত আঁশের পরিবর্তে থাকে অস্থিনির্মিত একটি আবরণ। ঠিক যেন একটা বর্মের মত ঘিরে থাকে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত। লেজটি বেশ ছোট এবং বর্মটি লেজের উপরে যেন সিল করে দেওয়ার মত দেখায়। লেজটা তাই নাড়াচাড়া করতে পারে এবং গর্ত খুঁড়লে লেজের দ্বারা গর্তের মুখটাকে আলতো ভাবে গুঁড়ো মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতেও পারে। তবে লেজটিও আবরণহীন নয়। অপর একটি অস্থিনির্মিত বর্ম লেজকে ঘিরে রাখে।

আর্মাডিলোরা নিশাচর। দৈর্ঘ্যে তিন ফুটের বেশী হয় না। প্যাঙ্গোলিনদের মত পেটের তলায় কোন আবরণ নেই। তাই এরাও শত্রুর গন্ধ পেলে কুণ্ডলী পাকিয়ে নেয়। এই অবস্থায় ওদের গোল একটা শামুক বলেই মনে হয়। গড়িয়ে দিলে বলের মত এন্তার গড়িয়েও যেতে পারে।

পরিশেষে গণ্ডারদের কথাও উল্লেখ করতে হয়। গণ্ডারের দেহে অস্থিনির্মিত কোন আস্তরণ থাকে না বা কুণ্ডলীও পাকায় না। বৈশিষ্ট্য এদের পুরু চামড়াটা। সেই চামড়া এত শক্ত যে বর্শা তো দূরের কথা বন্দুকের গুলিও হার মানে। ওদের

গায়ে লোমও থাকে না। কেবলমাত্র লেজের ডগায় ও চোখের কোণে সামান্য কয়েকগাছা লোম থাকে।

পৃথিবীতে প্রায় চার রকমের গণ্ডার দেখা যায়। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গণ্ডারের বাস আফ্রিকার জঙ্গলে। তাদের গায়ের রঙ সাদা অথবা কালো। নাকের ডগায় থাকে দুটি করে শিং। এরা উচ্চতায় সাড়ে ছ'ফুটের মত এবং ওজনে তিন কুইণ্টালের কাছাকাছি হয়ে থাকে।

অন্য তিন শ্রেণীর গণ্ডারকে দেখা যায় এশিয়া মহাদেশে। এদের প্রত্যেকেরই থাকে একটি করে শিং। ভারতে আমাদের সংরক্ষিত অরণ্যে ওদের পালন করা হচ্ছে। গণ্ডারের শিং-এর লোভে আগে শিকারীরা প্রচুর গণ্ডারকে হত্যা করতো। ব্যাপক হত্যার ফলে গণ্ডারের বংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। বর্তমানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করায় ওদের বংশ ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।

গণ্ডার তৃণভোজী ও নিরীহ প্রাণী। হাঁটেও বেশ মন্থর গতিতে। কিন্তু চটালে রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড মারমুখী হয়ে ওঠে এবং গুরুভার শরীরটাকে নিয়ে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ছুটতে আরম্ভ করে।

গণ্ডারদের আত্মরক্ষার প্রধান উপাদান—তাদের শিং। ঐ শিংটিরও বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। এর উপাদান গরু মহিষের শিং-এর উপাদান নয় কিংবা নাকের উপর অস্থি গজিয়ে শিং তৈরি করেনি। একগুচ্ছ চুল জাতীয় পদার্থ দিয়েই গড়ে উঠে ওদের শিং। অথচ এই শিং-এর এত শক্তি যে, রেগে গেলে এক একটি বড় জানোয়ারকেও এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এরা মাতৃগর্ভে কাটায় একটানা আঠার মাস।

(১১) **বনমানুষ**—জীবজগতের সেরা জীব মানুষ। মানুষের কাছাকাছি এক ধরণের জীবকে আমরা বনমানুষ বলে থাকি। ওদের শরীর স্থান, শরীর বৃত্ত, মস্তিষ্কের আয়তন, মনস্তত্ত্বঃ ইত্যাদির দিক থেকে বিচার করে বিজ্ঞানীরাও ওদের মানুষের নিকট আত্মীয়রূপে চিহ্নিত করেছেন।

বনমানুষদের দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন অরণ্যে যাদের দেখা যায় তাদের বলা হয় গিবন ও ওরাং ওটাং এবং আফ্রিকার ঘন অরণ্যে যাদের বাস তাদের দুটি প্রজাতি শিম্পাজী ও গরিলা। ওদের কারও লেজ নেই। দাঁড়াতে পারে এবং প্রয়োজন হলে দুপায়ে হাঁটেও। মাথার খুলির মধ্যে আবদ্ধ মস্তিষ্কের আয়তন মনুষ্যেতর যে কোন জীব থেকে অধিক।

এমনও মনে করা হয়, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল শাখাশ্রয়ী বানর জাতীয় জীব। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে এবং একটানা উষ্ণ প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার ফলে মাত্র কয়েক লক্ষ বছর

আগে ওদের কোন একটি প্রজাতি শাখা ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছিল। কালক্রমে ওরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল নানা শাখায়। পরে কোন একটি শাখা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল গরিলা, শিম্পাজী, ওরাং ওটাং প্রভৃতি। পরিশেষে বিবর্তনের নানা ধাপ অতিক্রম করতে করতে বনমানুষ থেকে আধামানুষ এবং পরে মানুষের উদ্ভব। অতএব বনমানুষরা যে মানুষের কাছাকাছি হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

গিবন, ওরাং ওটাং, শিম্পাজী ও গরিলা এই চার জাতের বনমানুষের ক্ষেত্রে শিম্পাজী ও গরিলারাই মানুষের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওরা দুজনেই প্রায় ৬ ফুটের মত লম্বা হয়ে থাকে। তবে স্ত্রী শিম্পাজী ও স্ত্রী গরিলারা আকারে পুরুষদের অপেক্ষা কিছু ছোট। দু-দলের মধ্যে গরিলারা আবার বেশ মোটাসোটা এবং বিশাল তাদের বক্ষ। হাত দুটো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। শিম্পাজীদের চেহারা এমন বিশাল নয়। বরং মানুষেরই কাছাকাছি। হাত দুটোও দৈর্ঘ্যে মানুষের হাতের মত। তবে শরীরের তুলনায় কানগুলো বেশ বড়, চোখ দুটো ছোট ও কোটরাগত।

গরিলা ও শিম্পাজী উভয়ের দেহে কালো বা মেহগিনি রঙের সোজা সোজা লোম থাকে। অবশ্য মুখে কারও লোম থাকে না। শিম্পাজীরা আবার বুড়ো হলে মানুষের মত মাথার চুল ও গায়ের লোম পেকে সাদা হয়ে যায়।

শিম্পাজী ও গরিলা উভয়েই গাছে চড়তে পারে। তবে শিম্পাজীরা গাছে চড়তে গরিলাদের চেয়েও ওস্তাদ। অনেক সময় মাটিতে হাঁটতে গেলে উভয়েই হাত ও পায়ের সাহায্য নেয়। তবে দুপায়ে হাঁটতে ওরা বেশ অভ্যস্ত। শোনা যায়, পুরুষ গরিলারা রেগে গেলে বুকে জোরে জোরে আঘাত করে এবং দুপায়ে ছুটে যায় শত্রুর দিকে। শিম্পাজীরা এভাবে বুক চাপড়ায় না।

শিম্পাজী ও গরিলাদের প্রধান খাদ্য তৃণ ও গাছের ফলমূল-কচিপাতা। শিম্পাজী আমিষ গ্রহণ করে না। তবে কিছু কিছু আমিষ গরিলাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সুযোগ পেলে গরিলারা ছোট ছোট প্রাণীদের সংহার করে।

ওরা সবাই জলকে বড় ভয় করে। কালেভদ্রে ঠোঁট ডুবিয়ে জলপান করে। জলভর্তি একটা সামান্য নালা দেখলেও তাকে অতিক্রম করার সাহস রাখে না। অন্য পথে ঘুরে যায়।

ওরা বেশ সমাজবদ্ধ জীব। স্ত্রী, পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখে ঘর-সংসার পাতে। রাতে ঘুমানোর সময় স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা গাছের ডালে থাকে আর তলায় প্রহরীর মত জেগে থাকে পুরুষ গরিলা বা শিম্পাজী। তলায় গাছের ডালে হেলান দিয়ে কখনও জেগে থাকে, আবার কখনও ঘুমায়। ওদের বাচ্চাদের

প্রতি চিতাবাঘ ও সিংহের অত্যন্ত লোভ। তাই পুরুষেরা এমন সজাগ থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সন্তান বাৎসল্য ঠিক মানুষের মত। কথা কিন্তু বলতে পারে না। কেবল কিচির মিচির শব্দ করে।

মানুষের মত না হলেও এরা বুদ্ধিমান। বহু চিড়িয়াখানায় ওদের রাখা হয়েছে। শেখালে অনেক কিছু শেখে ওরা। শিম্পাজীরা আবার চা, রুটি, কফি ইত্যাদি টেবিলে বসে খেতে পারে, দোলনায় দোল খায় ইত্যাদি। চিড়িয়াখানায় বন্দী অবস্থায় গরিলারা ৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। শিম্পাজীরা বাঁচে আর একটু বেশী। মাঝে মাঝে ওরা একটু গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ করলেও বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের বলা যেতে পারে।

* যাযাবর পাখী *

প্রাণীজগতের আর এক বিস্ময় যাবাবর পাখীর দল। প্রতি বছর শীতের প্রারম্ভে আকাশের দিকে নজর রাখলে প্রায়ই চোখে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে চলেছে কোন এক সুদূরের পানে। ঝাঁকগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে। কোন ঝাঁকে একটির পিছনে আর একটি, তার পেছনে আর একটি, এইভাবে সিঁড়ির ধাপের মত লম্বা সারি অথবা বল্লামের মত সোজা সারি বেঁধে ছুটে চলেছে। কোন কোন ঝাঁক চলেছে অর্ধবৃত্ত, বৃত্ত, অধিবৃত্ত অথবা উপবৃত্ত রচনা করে, আবার কোন ঝাঁক পাশাপাশি অবস্থান করে একটি সরলরেখা রচনা করে যাচ্ছে।

ওরা আকাশের অনেক উপর দিয়ে যাতায়াত করে। অধিকাংশ পাখী থাকে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উপরে। বুনো হাঁস, বক জাতীয় কিছু পাখী, পেলিক্যান প্রভৃতি মাঝে মাঝে দশ হাজার থেকে বিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে পথ পরিক্রমা করে। এদের খালি চোখে প্রায়ই দেখা যায় না। দিনের বেলায় চোখে দূরবীন লাগাতে হয় এবং রাতে রাডারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ওরা বোবা কেউ নয়। নিচ দিয়ে যারা যায় তাদের কলকণ্ঠ ভেসে আসে। বিভিন্ন ডাক শুনে পক্ষী বিশেষজ্ঞরা বুঝে নেয় কোন পাখীর দল উড়ে চলেছে আকাশে।

কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই যাযাবর পাখীর দলকে দেখা যায়। ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যায় বৃটেনে, আমেরিকায় এবং ইওরোপের কয়েকটি দেশে। এমনও শোনা যায়, বৃটেনে যখন যাযাবর পাখীরা নেমে আসে তখন চারদিকে ছায়া পড়ে যায়।

যাযাবর পাখীরা সুদীর্ঘ পথের পথিক। কেউ দিনের বেলায়, কেউ রাতে, কেউ বা দিনে রাতে উভয় সময় এক নাগাড়ে উড়ে চলে। ওরা নিতান্তই ছোট প্রাণী। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হয় তবু দিগ্‌ভ্রম ওদের হয় না। অজানার হাতছানিতে আকৃষ্ট হয়ে কিংবা কোন এক নেশায় মাতাল হয়ে সুখী গৃহকোণকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। মাসের পর মাস একটানা উড়ে চললেও খাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। জীবন-মরণ পণ করেই যেন তারা ঘর ছাড়ে, পথে সহস্র বাধাকে অতিক্রম করে, নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা মাস সুখে কাটায়। তারপর যেন ঘরের ডাক তারা শুনতে পায়। আর তখনই ফিরে আসে সেই একই পথে। ভুল তাদের হয় না।

পাখীদের এই যে দেশান্তরী হওয়ার মনোভাব—তা বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত এক বিস্ময়। তাঁরা এদের নিয়ে হরেক রকমের পরীক্ষা করেছেন, পায়ে হাল্কা ধাতব আংটি পরিয়ে অপেক্ষা করেছেন বছরের পর বছর, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছেন এদের দেহখানা, তাদের মূল বাসস্থান এবং যেখানে ওরা যায় সেখানে মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছেন, তবু সব প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নি। তবে যতটুকু বিস্ময়কর তথ্য তাঁরা পরিবেশন করেছেন তাও বড় কম নয়।

বিজ্ঞানীদের মতে সাধারণত দুটি কারণে পাখীদের দেশান্তরী হওয়ার মনোভাব প্রকট হয়। প্রথম ও প্রধান কারণ, শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা পাখীরা অতি শীতল পরিবেশকে পরিহার করার জন্য অবতরণ করে সমতলভূমিতে। সাধারণত সূর্যের আলো হ্রাস পেতে থাকলে এবং রাত্রির দৈর্ঘ বাড়তে থাকলে তারা ঘর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রচণ্ড শীতে তাদের পরিবেশে খাদ্য তখন সহজলভ্য হয় না। অপরদিকে মেরুদেশে একটানা শীতের পর যখন সূর্যোদয় ঘটে এবং গ্রীষ্মের সূচনা হয় তখন খাদ্য পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। তাই খাদ্যের লোভেই ঘর ছাড়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, নিকৃষ্ট শ্রেণীর এইসব প্রাণীরা—যারা বছরের দিন সংখ্যা, ঋতু, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি কিছুই জানে না, তারা কেমন করে বুঝতে পারে কখন ঘর ছাড়তে হবে? পরিবেশের তাপমাত্রার তারতম্য অনুভব করেই তারা বুঝে নেয়—এবার ঘর ছাড়ার ডাক এসেছে। আরও আশ্চর্য, অনেক ক্ষেত্রে তাদের পথপ্রদর্শকেরও প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, ঘর ছাড়া এবং পুনরায় ঘরে ফিরে আসার মূলে কিছু কিছু পাখীর অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির হর্মোন নিঃসরণের আছে এক বড় ভূমিকা। প্রচুর আহারের ফলে দেহে যে চর্বি জমে, সেই চর্বিই হর্মোন নিঃসরণের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আর ঐ হর্মোন নিঃসরণ হলেই একটানা

দীর্ঘদিন উপোসে কাল কাটাবার ক্ষমতা লাভ করে এবং তখনই ঘর ছাড়ে তারা। অপরদিকে নতুন বসতিতে এসে পুনরায় লাভ করে প্রচুর খাদ্য। কিছুকালের মধ্যে জমে উঠে চর্বি। তারপর সেই হর্মোন নিঃসরন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয় কারণটি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণও করেছেন। তাঁরা পাখীদের মস্তিষ্কের পিনিয়েল গ্রন্থিটি বিচ্ছিন্ন করে হর্মোন নিঃসরণ ব্যাহত করেছেন। ফলে দেখেছেন, এই অবস্থায় তাদের যাযাবর হওয়ার প্রবণতা লুপ্ত হয়ে গেছে অনেকখানি। ঐ হর্মোন নিঃসরণ ও ঘর ছাড়ার মূলে বংশ রক্ষার তাগিদও বিদ্যমান। কয়েকটা মাস বাহিরে থেকে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে বাচ্চাদের সঙ্গে করে ফিরে আসে স্বস্থানে।

যে কোন কারণেই হোক তারা ঘর ছাড়ে। কিন্তু কেমন করে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে! অবশ্য কিছু কিছু পাখী আছে, যারা শীত পড়লে পাহাড় থেকে নেমে আসে নিকটস্থ উপত্যকাগুলিতে। কিন্তু যারা হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে সাইবেরিয়া থেকে সুদূর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ছুটে যায়, তারা কেমন করে পথ চিনে নেয়?

অনেকের ধারণা, পাখীরা বরাবর একই পথে যাতায়াত করার জন্য দলের কিছু কিছু বয়স্ক পাখী তরুণদের পথ প্রদর্শন করে থাকে। কথাটা অনেকাংশে সত্যও। বিজ্ঞানীরা কারও কারও পায়ে হাল্কা আংটি বেঁধে ছেড়ে দিয়েছেন এবং পরের বছর দেখছেন সেই আংটিপরা পাখী এসে গেছে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। কিন্তু আর একটি পরীক্ষা করে বিস্মিত হয়েছেন। তারা সদ্যোজাত বাচ্চাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য জায়গায় বড় করেছেন এবং মূল দলটি চলে যাওয়ার পর তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, এইসব বাচ্চারা—যাদের পথ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই তারাও উপস্থিত হয়েছে তাদের মূল দলের সঙ্গে। পরের বছর পুনরায় দল এলে পায়ে আংটি দেখেই চিনে ফেলেন বিজ্ঞানীরা।

পথ চিনে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার পেছনে আগে বিজ্ঞানীরা অন্য রকম যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, দিনের বেলায় যে সব যাযাবর পাখী পথ হাঁটে তারা সূর্যকে দেখে পথ চিনে নেয় এবং রাতে যারা যায় তারা দিক্‌নির্ণয় করে আকাশের চন্দ্র ও তারামণ্ডলীকে দেখে। তবু সন্দেহ ছিল, মেঘলা দিনে কেমন করে পথ চিনে তারা? মহাসমুদ্রের বুকে অভিজ্ঞ নাবিকও মেঘলা দিনে পথ ঠিক করতে কত রকমের যন্ত্রপাতি, কত চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে। অথচ পাখীদেয় কোন অসুবিধা হয় না। কেমন করে সম্ভব হয়?

এর মূলে আজকাল বিজ্ঞানীরা যুক্তি দেখিয়েছেন, যাযাবর পাখীদের উপর পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব কাজ করে থাকে। এবং এরই জন্য তাদের

দিক্‌নির্ণয় করতে কোন অসুবিধা হয় না। আপনা হতেই পৌঁছে যায় লক্ষ্য স্থলে।

পৃথিবী নিজেই একটি চুম্বক। আকাশের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার চৌম্বক ক্ষেত্র। কোন কোন বিজ্ঞানী পায়রা এবং অন্যান্য দু-চার জাতের যাযাবর পাখীর মস্তিষ্কে অতি অল্প পরিমাণ চৌম্বক পদার্থ ফেরোসোফেরিক অক্সাইডের সন্ধান পেয়েছেন। পৃথিবী নিজে চুম্বক হওয়ার জন্য পাখীদের মাথায় ঐ চৌম্বক পদার্থ আকাশ মার্গে তাদের সঠিক পথের নির্দেশ দিয়ে থাকে।

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাও করেছেন অনেক। তাঁরা দেখেছেন, চৌম্বক ঝড়ের সময় পাখীরা একেবারে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পাখীদের গলায় হাল্কা চুম্বকের বলয় পরিয়ে ছেড়ে দিলেও তারা পথ ঠিক রাখতে পারে না।

এ ছাড়াও পাখীদের পথ চেনার ক্ষেত্রে আরও কারণ আছে। পাখীরা সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে দেখতে পায়। যার ফলে মেঘলা দিনে তাদের অসুবিধা হয় না। অথচ আমরা এত উন্নত জীব তবু আমাদের চোখে রশ্মিটি একেবারে অদৃশ্যই থেকে যায়। অপরদিকে স্থানভেদে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে তাও যাযাবর পাখীরা ধরে ফেলতে পারে।

যাই হোক যাযাবর পাখীদের পথ চেনার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এখনও গবেষণার অন্ত নেই। কালে হয়ত আরও অনেক তথ্য জানা যাবে। তবে পাখীদের ঐ ক্ষমতাটি চিরকাল মানুষের কাছে একটি বড় বিস্ময় হয়ে থাকবে। অপরদিকে ঐ ক্ষমতাটিকে মানুষ যদি যন্ত্রের সাহায্যে অনুকরণ করতে পারে তাহলেও অনেক উপকারে আসবে মানুষের।

যাযাবর পাখীদের সম্বন্ধে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা, এরা বিশ্রাম না করে হাজার হাজার মাইল পথ কেমন করে পাড়ি দেয়?

বিশ্রাম যে কেউ করে না—এমন নয়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে বড় বড় ঝিল কিংবা নদীর তীরে কিছুক্ষণের জন্য কোন কোন দল নামে। কিছু কিছু খাবার সংগ্রহ করেও খায়। তারপর প্রভাতের অনেক আগেই উঠে যায় আকাশে। তবে এমনও দল আছে, যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একনাগাড়ে উড়ে চলে লক্ষ্যস্থলের দিকে। ওদের ক্লান্তি আসে না, ডানা দুটো অবশ হয়ে পড়ে না, মাথা ঘুরে পড়েও যায় না। কলকণ্ঠে আকাশ বাতাস মুখরিত করে বিরামবিহীন ভাবে দ্রুত ছন্দে পথ চলা—এ চলার যেন শেষ নেই।

এইভাবে উড়ে চলার পেছনে পাখীদের দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্য অবশ্য অনেকখানি দায়ী। ওদের দেহের হাড়গুলো ফাঁপা হওয়ায় হাড়ের ভেতরে যথেষ্ট বায়ু থাকে। দেহের বহির্ভাগে থাকে হালকা পালকের আচ্ছাদন। দেহের অনুপাতে হালকা ডানাজোড়া বেশ বড়। ঐ কারণে নিজেদের দেহের আয়তনের তুলনায় যথেষ্ট

হালকা। ডানাজোড়া বিস্তার করে বায়ু সমুদ্রে ভেসে থাকতে এবং একটানা উড়ে চলতে কোন অসুবিধা হয় না। বাতাস কেটে তরতর করে উড়ে যেতে অবশ্যই প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয়। সেই শক্তির মূলেও আছে তাদের দেহের কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা। প্রথমতঃ ওদের ফুসফুসের সঙ্গে অতিরিক্ত কতকগুলি বায়ুথলি যুক্ত থাকে। দ্বিতীয়তঃ ওদের রক্তে থাকে প্রচুর গ্লুকোজ। তৃতীয়তঃ ওরা যে খাদ্যগুলি গ্রহণ করে সেগুলি তাদের দেহে উৎপন্ন করে প্রচুর তাপ। ঐ কারণগুলির জন্য তারা প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করে। এবং বেশীক্ষণ উড়ে চললেও কাহিল হয়ে পড়ে না। তবে কেউ যে অসুস্থ হয়ে পড়ে না এমন নয়। অসুস্থ হয়ে পড়লেই কোন নির্জন জায়গায় নেমে পড়ে। তারপর সুস্থ হয়ে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করলে কোন দলের সঙ্গে ভিড়ে যায়। তবে বর্তমানে মানুষের শ্যেন দৃষ্টি থেকে রক্ষা পায় না কেউ।

তৃতীয় আর একটি প্রশ্ন, ওরা একটানা এতদিন না খেয়ে থাকে কেমন করে ?

এর উত্তরে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, যখন ওরা পর্যাপ্ত খাবার পায় তখন তাদের দেহে পর্যাপ্ত চবি জমে উঠে। এত চর্বি জমে যে দেশান্তরী হওয়ার প্রাক্কালে কারও কারও ওজন বেড়ে প্রায় দেড়গুণের মত হয়ে যায়। সেই চর্বিই তাদের জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে। এটি যে সত্য ঘটনা তার কারণ, দীর্ঘ আকাশ পরিক্রমার পর ওরা একেবারে শীর্ণ হয়ে পড়ে।

দুঃখের বিষয় যত পাখী ঘর ছাড়ে তাদের সবাই ফিরে আসতে পারে না। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো আছেই, তার উপর আছে মানুষের লোভ। প্রতি বছর বড় বড় ঝিল, হ্রদ এমনকি দূর সমুদ্রের দ্বীপগুলিতে হানা দিয়ে মানুষ সহস্র সহস্র পাখীকে হত্যা করছে এবং তাদের ডিম বহে নিয়ে আসছে। তাছাড়া মানুষের আধুনিক সভ্যতাও যাযাবর পাখীদের কাছে একটা বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার জন্যও প্রাণ হারাতে হচ্ছে হাজার হাজার পাখীকে। গগনচুম্বী অট্টালিকা, বিদ্যুৎ স্তম্ভ, টেলিভিসন টাওয়ার প্রভৃতিতে ধাক্কা খাচ্ছে প্রতি বছর কত অজস্র পাখী। তাছাড়া আছে শহরাঞ্চলে বিদ্যুতের আলো। রাত্রিতে ঐ আলো তাদের মাঝে মাঝে দিশেহারা করে দেয় এবং যেখানে সেখানে ধাক্কা খায়। তবে সাবধানতা তারা অবলম্বন করে। যে পথে তারা বাধা পায় পরের বছর সে পথে আর যাতায়াত করে না। হয়ত এই কারণে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আর আগেকার মত এত পাখী শীতকালে দেখা যায় না।

যাযাবর পাখীর সংখ্যা অজস্র। বহু প্রজাতি যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে থাকে। তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটির পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো।

আর্কটিক টার্ন—এরা শীতল পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত নয়। আকারে

আমাদের দেশের শঙ্খচিলের মত। কানাডার আর্কটিক অঞ্চল থেকে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে বলেই ওদের অনুরূপ নামকরণ। সারা গ্রীষ্মকালটা ওরা আর্কটিক অঞ্চলে কাটায়। তারপর শীতের প্রারম্ভে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে যাত্রা করে। একদল যায় সোজা দক্ষিণ মেরুর দিকে, একদল যায় অস্ট্রেলিয়ায় এবং তৃতীয় আর একদল আফ্রিকার পূর্ব উপকুল ঘুরে দক্ষিণ মেরুসাগরের দিকে যায়। সবচেয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ঐ আর্কটিক টার্ণরাই। দেখা গেছে, যাওয়া আসায় ওরা প্রায় চল্লিশ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে। এরা ভারতে আসে না। তবে যারা অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয় তারা ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে যায়। মে মাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

কানাডার হাঁস—এরা উত্তর আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা। অক্টোবর মাসের দিকে শীতের শুরুতে ওরা হাডসন উপসাগরীর অঞ্চলে জড় হয়। তারপর সেখান থেকে তারা উড়ে যায় উত্তর ক্যারোলিনা অঞ্চলে। যাতায়াতে মোট যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটারের মত। এপ্রিলের দিকে বাড়ী ফেরে ওরা।

কানাডার প্লোভার—এরা দুটি প্রজাতিতে বিভক্ত। একটি প্রজাতির বাসস্থান আলাস্কার তুন্দ্রা অঞ্চলে। তুন্দ্রা অঞ্চলের বাসিন্দাদের আবার গোল্ডেন প্লোভারও বলা হয়। অপর প্রজাতি বাস করে কানাডার আর্কটিক অঞ্চলে। আলাস্কার বাসিন্দারা ৩৪৫০ কিলোমিটার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে হাজির হয় হাওয়াই দ্বীপে। ওরা ঘর ছাড়ে সেপ্টম্বর-অক্টোবরের দিকে। অপরদিকে আর্কটিক অঞ্চলের প্লোভাররা আর একটু পরে ঘর ছাড়ে এবং উপস্থিত হয় দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। উভয়েই প্রত্যাবর্তন করে মে মাসের দিকে।

বোবোলিঙ্ক—বোবোলিঙ্করাও কানাডার অধিবাসী। শীতের প্রারম্ভে ওরা ঘর ছাড়ে। সুদীর্ঘ ১৭০০০ কিলোমিটারের মত পথ অতিক্রম করে ছুটে আসে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে আর্জেণ্টিনায়।

হোয়াইট স্টার্ক—হোয়াইট স্টার্করা ইওরোপের বাসিন্দা। হল্যাণ্ড, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি বহু জায়গায় ওরা বাস করে। গ্রীষ্মকালটা ওরা নিজেদের দেশেই কাটায়। তারপর শীতের শুরুতে দেশত্যাগী হয়। এদের অনেকেই আসে ভারতে। কিছু কিছু এশিয়ার অন্যান্য জায়গায় এবং দ্বীপগুলিতে শীতকালটা কাটিয়ে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে দেশে ফিরে যায়।

সোয়ালো—সোয়ালোরা স্কাণ্ডিনেভিয়ার বাসিন্দা। এরা ছুটে আসে আফ্রিকায়। প্রায় বিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এরা। বসন্ত সোয়োলোরা

বসন্তকালে ব্রিটেনে আসে। ডিম পাড়ে। বাচ্চা বড় হলে গ্রীষ্মের শেষাশেষি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায়।

পেট্রিল ও অ্যালাবট্রাস—এরা দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বাসিন্দা। দক্ষিণ মেরুতে শীতের শুরুতে ওরা স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এবং মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পুনরায় দক্ষিণ মেরুতে দীর্ঘ রাত্রির অবসান ঘটলে ফিরে যায় স্বদেশে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয় যে, উত্তর গোলার্ধের পাখীরাই বেশী যাযাবর। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ বেশী হওয়ায় শীতের প্রারম্ভেই তুষার জমতে শুরু করে, বহুস্থান বরফে বরফে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, তাই বাধ্য হয়ে ওদের ঘর ছাড়তে হয়। তবু স্থায়ী বাসিন্দা কিছু আছে। সংখ্যায় কিন্তু তারা নিতান্ত কম। অপরদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ কম। সেই কারণে স্থলচর পাখীদের সংখ্যাও সেখানে কম। অধিকাংশই সামুদ্রিক পাখী। পেট্রিল এবং অ্যালবাট্রাসরাও সামুদ্রিক পাখীদের অন্যতম। সমুদ্রে ততখানি দুর্যোগ আত্মপ্রকাশ করে না। তাই বেশ দেরীতে ওরা ঘর ছাড়ে এবং বেশীদূরেও তাদের উড়ে যেতে হয় না। এরা উত্তরাভিমুখী। উত্তর গোলার্ধের সমস্ত পাখী দক্ষিণের দিকে যাত্রা করে।

যাযাবর অ্যালবাট্রাস পাখীরা আবার একটু ভিন্ন ধরণের। ওদের প্রায় তেরটি প্রজাতি আছে। গায়ের রঙ কালো, ধূসর অথবা সাদা। কালো অ্যালবাট্রাসরা আকারে বেশ বড়। কয়েক জাতের অ্যালবাট্রাস আবার সমুদ্রে নাবিকদের বন্ধু। কোন কোন সময় জাহাজ বিপদে পড়লে ওরা দল বেঁধে ছুটে আসে। আকাশে ওদের ওড়ার গতি অতি দ্রুত। এমনকি জাহাজও ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তাই সামুদ্রিক দুর্যোগে ওরা জাহাজের সামনে এগিয়ে গিয়ে জাহাজকে পথ দেখায়। ঠিক যেন ডলফিনদের মত।

অ্যালবাট্রাসরা দল ছাড়া কখনও একক থাকে না। কোন কোন প্রজাতির অ্যালবাট্রাস ৬০০০ মাইল পর্যন্ত উড়ে গিয়ে নতুন বসতিতে উপস্থিত হয়। ডাঙায় ওরা ভালভাবে চলতে পারে না। দলবদ্ধভাবে মাটিতে ওরা নাচতে ভালবাসে। ভারি মনোরম সে দৃশ্য।

অপরাপর যাযাবর পাখীদের মধ্যে আর্কটিক স্কুয়া, হামিং বার্ড, হলদে ঠোঁট-ওয়ালা কোকিল, পেনটেল ডাক প্রভৃতি অন্যতম। আর্কটিক স্কুয়ারা আর্কটিক অঞ্চল থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ছুটে যায় নিউজিল্যাণ্ডের দিকে। হামিং বার্ডরা খুব ছোট। তথাপি ওরা উত্তর আমেরিকা থেকে মেক্সিকো উপসাগর অতিক্রম করে প্রায় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করার পর ছুটে আসে দক্ষিণ আমেরিকায়। হলদে ঠোঁটওয়ালা কোকিলরাও তাই করে।

যাযাবর পাখীদের বিস্ময়কর অভিযান সব দেশের মানুষকে মুগ্ধ করে। তাই প্রতিটি দেশের কিছু কিছু প্রাণীতত্ত্ববিদ এদের অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তৎপর। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রতি বছর ছুটে আসে অজস্র যাযাবর পাখী। তাদের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে নানা পক্ষী নিবাস। বহু ভারতীয় বিজ্ঞানীও তাদের নিয়ে গবেষণায় রত আছেন। কিন্তু ব্যাপকভাবে পাখী হত্যা এবং পাখীদের পূর্বের কিছু কিছু আবাসস্থলকে ভরাট করে দেওয়ায় যাযাবর পাখীদের আগমন ধীরে ধীরে কমতেই আছে। এইসব শীতের অতিথিদের প্রতি একটু সহানুভূতি দেখালে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলে কিছু কিছু এলাকা একেবারে আনন্দমুখর হয়ে উঠতো। আমাদের কর্মময় জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আনতে পারতো।

পশুপাখীর সহ-অবস্থান ও বন্ধুত্ব

বড় বিচিত্র এবং বড় অদ্ভুত পৃথিবীর এই জীব-জগৎটা। শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ থেকে অতি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পর্যন্ত কেউ সহজে হারিয়ে যেতে চায় না। তারা বেঁচে থাকতে চায়, পৃথিবীর জল হাওয়াকে কিছুকাল ভোগ করতে চায় এবং আপন অস্তিত্বকে সন্তানসন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত করে অমর হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু বেঁচে থাকার নানান সমস্যা। খাদ্য চাই, পানীয় চাই, জীবন রক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ চাই, শত্রুর কবল হতে মুক্ত হওয়া চাই, ইত্যাদি কত কি! তাই প্রতিটি জীবকে বেঁচে থাকতে হলে কঠোর জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। পৃথিবীর বুক থেকে যেন জোর করে জীবন ধারণের উপাদান সংগ্রহ করতে হয় এবং জীবনে আনতে হয় নিরাপত্তা। এগুলি কিন্তু একক কোন জীবের দ্বারা সম্ভব হয় না। দলবদ্ধভাবে এবং পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব হয়ে থাকে।

মানুষ বুদ্ধিমান জীব। আপন নিরাপত্তার জন্য এবং চাহিদা পূরণের জন্য পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করে, দলবেঁধে বাস করে, অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বও স্থাপন করে। এই যে মানুষে মানুষে সহ-অবস্থান ও বন্ধুত্ব—এ কেবল নিজেদের দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এই মনোভাবের পেছনে লুকিয়ে আছে আপন স্বার্থ তথা আপন অস্তিত্বকে বজায় রাখা। মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক তাও প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আপাতদৃষ্টিতে একজাতীয় জীবের সঙ্গে অপর জাতীয় জীবের যেন একটা বৈরী ভাব দেখা যায়। জীব-জগৎটা আবার খাদ্য শৃঙ্খলে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। অপেক্ষাকৃত বড়রা ছোটদের কাছে শত্রু বিশেষ। ছোট যে পিপড়ে

সেও দলবেঁধে বড় বড় পোকামাকড়কে ঘায়েল করে; পিঁপড়েদের উদরসাৎ করে ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীরা; শিকারী পাখী, সাপ ইত্যাদি ব্যাঙের শত্রু; গোসাপ, বেজি সাপদের সংহার করে; শিয়াল, খাটাস প্রভৃতি পাখী ও অন্যান্য ছোট ছোট জীবজন্তুদের বাচ্চা চুরি করে খায়, ইত্যাদি। এইভাবে খাদ্যখাদক সম্পর্কের জন্য কারও বংশ অস্বাভাবিক-ভাবে বেড়ে উঠতে পারছে না। জীব-জগতের সর্বত্রই যেন একটা সাম্যভাব।

জীব-জগতের আর এক বৈশিষ্ট্য, তারা অকারণ শত্রুতা করে না। খাদ্যশৃঙ্খলে যুক্ত নয় এমন প্রাণীরা ভুলেও শত্রুতা করতে আসে না। বরং এ ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের ভাবই প্রকট। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে জৈবিক প্রয়োজনে। আর আশ্চর্য! যারা জৈবিক প্রয়োজনে বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, তারা বংশ পরম্পরায় মর্যাদা রক্ষা করে আসছে বন্ধুত্বের। বড় বিচিত্র ও বড় অদ্ভুত সেই বন্ধুত্বের মূল্যবোধ! শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষা ও নিজ বংশধারাকে অটুট রাখার সে এক অভিনব উপায়। আজকের উন্নত জীব মানুষ তাদের বন্ধুত্ব দেখে কেবল বিস্মিত হয় না, সভ্যতার পক্ষে শিক্ষণীয় এক মহৎ উপকরণ রূপে চিহ্নিত করে থাকে।

জীবরা নানা কারণে একে অপরের বন্ধুত্ব স্বীকার করে এবং পালন করে জীবনের বিনিময়েও। নিম্নে তাদের বন্ধুত্বের স্বরূপগুলি উল্লেখ করা হলো।

সহ-অবস্থান ও বন্ধুত্ব—জৈবিক প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রাণীদের যে গুণটি সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হলো তাদের সহ-অবস্থানের মনোভাব। নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সহ-অবস্থান যেন ওদের প্রকৃতিগত।

গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন তথা একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস—এটি বহু প্রাণীর একেবারে সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকার সুফল অনেক পরে তথা গুহাবাসের কালে অনুভব করেছিল। অথচ সেই আদি থেকে তৃণভোজীরা, নানা জাতের পাখীরা, যেন একটা গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন-যাপন করে আসছে' সে ধারা অব্যাহত আছে আজও।

প্রথমে আমাদের চারপাশে যে সব পশুপাখীরা ঘুরে বেড়ায় তাদেরই কথায় আসা যাক। গবাদি পশুদের মাঠে ছেড়ে দিলে তারা দল বেঁধেই চরতে থাকে। গাভীরা সচরাচর অপরের বাচ্চাকে কাছে ভিড়তে দেয় না। কিন্তু কারও বাচ্চাকে সেখানে কুকুরে যদি তাড়া করে তাহলে শিং উঁচিয়ে ছুটে যায়। সেখানে আত্মপর বিবেচনা করে না। একই গোয়ালের গরুরাও কদাচ নিজেদের মধ্যে মারপিট করে না। পরন্তু বাহিরের কেউ ওদের একজনকে তাড়া করলে দলের সবাই তাকে ঠেকাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

আমাদের চারপাশে যে সব পাখীদের ঘুরতে দেখি তাদের মধ্যে কাক, ছাতার, চড়ুই প্রভৃতি পাখীরা দলবদ্ধ হয়েই বাস করে। কাকরা নিজেদের মধ্যে যত ঝগড়াঝাটি করুক না কেন, একজন বিপদে পড়লে দল ছুটে আসে। একটা কাক মায়ের বাচ্চাকে রাতে পেঁচা চুরি করলে পরদিন প্রভাতে কাকদের যেন সভা বসে যায়। চিৎকার ও চেঁচামেচিতে চারদিক ভরিয়ে তোলে এবং শত্রুকেও কখনও কখনও খুঁজেও বার করে। ছাতার ও চড়ুইরাও থাকে দল বেঁধে। কেউ একজন যদি কোন শত্রুর গন্ধ পায় তাহলে চিৎকার করে দলের সবাইকে সাবধান করে দেয়।

বেঁচে থাকতে গেলে খাদ্য অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে এবং খাদ্য সংগ্রহ করতে গেলে ইতঃস্ততঃ বিচরণ করতে হবে, আর ঐ বিচরণ করতে গেলেই শত্রুর কবলিত হতে হবে। এক্ষেত্রে এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে সন্ন্যাসী কাঁকড়ারা। তারা নিজদেহে আশ্রয় দান করে সাগর কুসুমদের।

বেচারা সাগর কুসুম! হাঁটতে তারা পারে না এবং ওদের বিষাক্ত হুলের জন্য ধারে পাশেও কেউ আসে না। অপরদিকে সন্ন্যাসী কাঁকড়াদের গায়ে শক্ত খোলস থাকলে কি হবে পেছনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে অনাবৃতই থাকে। জীবজন্তুরা জানে সন্ন্যাসী কাঁকড়ার দুর্বলতার কথা। তাই সন্ন্যাসী কাঁকড়ারা পেছনে বসিয়ে রাখে এক একটি সাগর কুসুমকে। গল্পের সেই খঞ্জকে কাঁধে করে অন্ধের পথ হাঁটার মত। ওতে সুবিধা হয় দু-তরফেরই। কাঁকড়ারা বিষাক্ত হুলযুক্ত সাগর কুসুমদের বহন করে নির্ভয়ে এগিয়ে যায় এবং সাগর কুসুমরা পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার সুবিধা পায়। বেইমানী ওরা জীবনে করেনা।

যে সব নদীতে কুমীর থাকে সেই সব নদীর চরে ঘুরে বেড়ায় অজস্র ছোট ছোট পাখী। বেশ লম্বা লম্বা ঠোঁট এদের। কুমীরের দাঁতের ফাঁকে এক রকমের জোঁক প্রায়ই বাসা বাঁধে। ফলে নাজেহাল করে ছাড়ে কুমীরকে। লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখীরা কুমীরকে ডাঙায় দেখলে ছুটে যায়। আর অমনি কুমীর হাঁ করে পড়ে থাকে। পাখীরা জোঁক সাফ করার জন্য কখনও কখনও কুমীরের মুখের ভেতরে ঢুকে যায়। কিন্তু এত হিংস্র যে কুমীর, সেও কিছু বলে না পাখীদের।

অরণ্যে বাঘ-সিংহদের অত্যাচারে অরণ্য যেন সব সময় কম্পিত থাকে। অথচ অরণ্যে তৃণভোজীদেরও বাস করতে হয়। নিরীহ হরিণরা দল বেঁধে চরতে দেখলে শালিক জাতীয় পাখীরা ছুটে যায় তাদের কাছে। হরিণদের গায়ের পোকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এঁটেলিকে খায় আর মাঝে মাঝে আকাশে চক্কর দেয়। কাছে পিঠে কোন হিংস্র জন্তুকে দেখলেই চিৎকার জুড়ে দেয়। আর তখনই সাবধান

হয়ে পড়ে হরিণরা। অনেকক্ষেত্রে নিরীহদের উপকারের জন্য হিংস্রজন্তুরা যখন রাতে নিঃশব্দে অগ্রসর হয় তখন তাদের পেছনে ফেউ লাগে।

ফিঙে নামক পাখীদের খাদ্য কীট ও পতঙ্গরা। কিন্তু তারা তাদের বাসায় এক ধরণের বিছেকে কিছুই বলে না। ফিঙেদের পালকের তলায় একরকম ছোট পোকা বাসা বাঁধে। ঐ বিছেরা তাদের পালকের ভেতর থেকে কীটগুলোকে সাফ করে ফেলে। পশুপাখীদের মধ্যে সহ-অবস্থানের নজির এমন আরও কত আছে।

অযাচিত সাহায্য—পশুপাখীদের মধ্যে অযাচিত ভাবে সাহায্য করার ঘটনাও বিরল নয়। এক্ষেত্রে একজন অপরজনকে সাহায্য করে কিন্তু কোন প্রতিদান গ্রহণ করে না। অপরকে সাহায্য বা সাবধান করাটাই যেন তাদের স্বভাব। পূর্বে যে ফেউর কথা বলা হয়েছে তা অযাচিত সাহায্যেরই উদাহরণ। এক জাতীয় পাহাড়ী ভেড়া আছে, যাদের গতি অতীব মন্থর। আর তাদের ঐ মন্থর গতির জন্য হিংস্র জন্তুরাসহজে ঘায়েল করতে পারে। তাই বেচারা ভেড়ারা বুনো কুকুরদের দলের কাছাকাছি চরে বেড়ায় নয়ত বিশ্রাম করে। কুকুররা তাদের আদৌ হিংসে করে না। পরন্তু কাছে পিঠে ভেড়াদের শত্রুকে দেখলে শীস দিয়ে সাবধান করে দেয়। একাজটি বনের বানর বা হনুমানরাও তৃণভোজীদের জন্য করে থাকে। তবে শীস্ দেয় না, চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়।

ফিঙেরা এক অদ্ভুত ধরণের পাখী। দুর্দান্ত ক্রোধী ও সাহসী। আপন বাসার ধারে কাছে চিল, পেঁচা প্রভৃতি শত্রু পাখীদের ভিড়তে দেয় না। আকারে ছোট হলে কি হবে, ছুটে গিয়ে সুতীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে। ঐ কারণে বড় বড় পাখীরাও ফিঙেদের ভয় পায়।

ফিঙেদের আরও একটি স্বভাব-সন্ধ্যার আঁধার নামার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ঢুকে পড়ে না। বাসার চারদিকে অনেকক্ষণ লাফালাফি দাপাদাপি করে। জ্যোৎস্না রাতে তো সারারাত জেগে থাকে। দুর্বল পাখী যারা তারা ঐ ফিঙেদের ধারে পাশেই বাসা বাঁধে। ফিঙেরা ওদের কিন্তু কিচ্ছুটি বলে না। বরং কোন চোর ওদের বাচ্চা চুরি করতে এলে ভয়ানকভাবে তাড়া করে। ফিঙেদের এই অদ্ভুত গুণের সত্যিই কোন তুলনা হয় না। প্রতিবেশী দুর্বলদের জন্য এমন মমত্ববোধ মানব-সমাজেও দুর্লভ।

দুর্বলকে সাহায্য করার নজির পশুপাখীদের সমাজে আরও আছে। হাতীরা ভয়ঙ্কর শক্তিশালী জীব এবং চেহারাটাও বিশাল। ওদের পিঠের উপর চেপে থাকে এক জাতীয় ছোট ছোট পাখী। হাতী যখন বনবাদাড় ভেঙে দ্রুত চলতে থাকে তখন ঝোপে ঝাড়ে লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট পতঙ্গরা ভয়ে ছিটকে আসে। তখন ঐ পাখীরা তাদের ধরে ধরে খায়।

মাঠে গরু ছাগলরা যখন চরতে থাকে তখন তাদের পিঠের উপর ফিঙেরা বসে দিব্যি লেজ দোলাতে থাকে। মাঠের ফাটলে ফাটলে লুকিয়ে থাকে একরকমের ছাই রঙের ফড়িং। মাটির সঙ্গে গায়ের রঙটাকে এমন বেমালুমভাবে মিশিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে যে, ফিঙেরা সহজে তাদের হদিশ পায় না। কিন্তু গরু ছাগলের পায়ের চাপে বা তাড়া খেয়ে ফড়িংরা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে। আর তৎক্ষণাৎ ফিঙেরা রসগোল্লার মত টুপ করে মুখে পুরে দেয়। ফিঙেদের বাধা দেয় না গরু ছাগল।

হাতী যখন চলতে থাকে তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে। ওতে ছোট ছোট প্রাণীরা হাতীর পায়ে পিষ্ট হতে পারে না—দূরে ছিটকে পড়ে। এমনও দেখা যায়, ছোট ছোট জন্তু জানোয়ার দৈবাৎ হাতীর সামনে পড়ে গেলে হাতীরা শুঁড় দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

হাতীদের আরও একটা মহৎ গুণ আছে। কোন হস্তীশাবক যদি মাতৃহারা হয় তাহলে তার প্রতিপালনের ভার নেয় অপর কোন হস্তিনী। সন্তানহারা মা বেড়ালরাও অপরের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে। কিন্তু মা-হাতীদের মত নয়। মাতৃহারাকে প্রতিপালন করা যে-কোন হাতী মায়ের সহজাত প্রবৃত্তি। এমনকি নিজের সন্তান থাকলেও।

এ ব্যাপারে মেরু অঞ্চলের পেঙ্গুইনদের আচরণ আরও অদ্ভুত। মেরু অঞ্চল বরফের রাজ্য। এত শীতে পেঙ্গুইনদের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে পারে না বা কোথাও বসে তা-দেওয়ার সুযোগ নেই। তাই তাদের পায়ে থাকে থলে। ঐ থলেতে তারা ডিম রাখে এবং সেইখানে থাকতে থাকতে ডিম ফোটে।

বরফের উপর চলাফেরা করার সময় অসাবধানতাবশতঃ কখনও কারও কারও ডিম পড়ে যায়। সেটি যে-কোন একজনের দৃষ্টিগোচর হলেই নিজের থলিতে তুলে রাখে।

নেকড়ে মায়ের মানবশিশুকে প্রতিপালনের গল্পও মিথ্যে নয়। বর্তমানেও অনেকে নেকড়ে মাকে পোষ মানাচ্ছেন এবং তাকে দিয়ে মানবশিশুকে বড়ও করাচ্ছেন। এদের মাতৃস্নেহের কাছে মানব মায়ের মাতৃস্নেহও পরাজিত।

জৈবিক প্রয়োজনে বন্ধুত্ব—জীব অমর নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে জীবের দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও তার অস্তিত্বের সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্তি ঘটেনা। সে বেঁচে থাকে তার বংশধারার মধ্যে—তথা আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে। অবশ্য প্রকৃতিও চায় না কাউকে নিঃশেষ করে ফেলতে।

সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিজেকে অমর করে রাখা জীবের প্রকৃতিগত এবং তারই

বহিঃপ্রকাশ জীবনের সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নির্বাচন। প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা এগুলির মূলেও জীবের স্বার্থ বিদ্যমান বললেও মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। অমর হয়ে থাকার জন্যই যেন জৈবিক তাড়না অনুভব করে, অথচ জীব মাত্রেই এই গুপ্ত রহস্যটা বিস্মৃত হয়ে থাকে।

জৈবিক প্রয়োজনে তথা বংশধারা বজায় রাখার তাগিদে জীবনের সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী নির্বাচন ইতর জীবজন্তুদের মধ্যেও দেখা যায়। উন্নত জীব মানুষের মধ্যে সঙ্গী ও সঙ্গিনীর মধ্যে ভালবাসার ফাটল ধরতে দেখা গেছে কিন্তু এমন অনেক জীবজন্তু আছে যাদের পরস্পরের ভালবাসা চিরকালই আটুট থাকে। কোনদিন একটুখানি ফাটলও ধরেনা।

এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত চিতা বাঘ এবং সমুদ্রের নীল তিমি। যৌবনে অপরাপর বহুজীবের মত এরাও সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নির্বাচন করে নেয়। এবং আজীবন তাদের ভালবাসা নিষ্ঠা সহকারে পালন করে থাকে। এমনও দেখা গেছে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যদি একজন কেউ সেই যৌবনেই মারা যায় তাহলে ওরা দ্বিতীয় সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী নির্বাচন করে না। স্ত্রী-চিতা এবং স্ত্রী-তিমি আবার সুকঠোর বৈধব্য জীবন যাপন করে বলে অনেকের বিশ্বাস।

এতটা না হলেও বহু পাখীর মধ্যে এমন গুণ দেখা যায়। শালিক, বুলবুল, দোয়েল, তিতির, ঘুঘু প্রভৃতি আমাদের দেশীয় পাখীগুলি সব সময় জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে। বাসা তৈরি করে, পালা করে ডিমে তা দেয় নয়ত স্ত্রী-পাখী তা দিতে থাকলে পুরুষ-পাখী তাকে আহার জোগায়, উভয়ে মিলে সন্তানও প্রতিপালন করে। দেখা গেছে, ওদের একজনকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে যেন বুকফাটা হাহাকারে ভরিয়ে দেয় চারদিক। তিমিরদের তো কথাই নেই। একটাকে মেরে ফেলে রাখলে আপরটিও ছুটে আসে এবং আজীবনের সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীটিকে ঘিরে যেন বিলাপ জুড়ে দেয়।

কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা আবার জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের সময় পূর্বরাগ প্রকাশ করে। মাকড়সার কথা আগে বলা হয়েছে। দোয়েল, হাতী ও প্রয়রী কুকুররা যাকে সঙ্গিনী করতে চায় তার মন জয় করার জন্য নানারকম চেষ্টা করে থাকে। সঙ্গিনী খুশি হয়ে ধরা দিলে সুখে ঘর-সংসার পাতে।

পেঙ্গুইন পাখীরা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সবাই এক জায়গায় জড় হয় এবং সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচন করার পর জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায়, ডিম পাড়ে ও বাচ্চা প্রতিপালন করে। তারপর শীত নামলে দুর্যোগ আরম্ভ হয়, পেঙ্গুইনরা তখন মেরুদেশ থেকে দূরে সরে গিয়ে জীবন রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়।

নিয়ম বহির্ভূত বন্ধুত্ব—প্রাণীরা খাদ্যশৃঙ্খলে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত

থাকার জন্য শত্রুতা তাদের বংশগত। সদ্য চোখ ফোটা একটা বেড়াল ছানার সামনে মাছ কিংবা ইঁদুরের ছানাকে ধরলে খাওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠে, ছোট যে বাঘের ছানা সেও একটা তৃণভোজীকে দেখলে শিকারের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। সদ্য ডিম-ফোটা পাখীর বাচ্চার সামনে ফড়িং ধরলে গিলে ফেলতে দ্বিধা বোধ করে না। এমনই আরও কত অজস্র ঘটনা!

ফল কথা, খাদ্য ও খাদকের মধ্যে শত্রুতা যেন তাদের গায়ের রক্তের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। তথাপি দেখা গেছে, কোন দুর্যোগের দিনে তারা খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে সহ-অবস্থান করতে দ্বিধাবোধ করে না। বন্যার সময় দেখা যায়, কোন এক উঁচু জায়গায় বিষধর সাপ, ব্যাঙ, গবাদি পশু প্রভৃতি অনেকে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। অথচ কেউ কাউকে কিছু বলে না। বন্যার জলে সাময়িকভাবে যেন তাদের শত্রুতা ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যায়।

বৃষ্টির শেষে মাঠে এক জাতীয় কাঁকড়াকে গর্তখুড়ে মাটির গভীরে আশ্রয় নিতে দেখা যায়। সেই গর্তে আবার আশ্রয় গ্রহণ করে চ্যাং, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছেরা। মাছ ও কাঁকড়া দিব্যি সহ-অবস্থান করে। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী কনরাড লরেঞ্জ উত্তর আমেরিকায় একটি গর্তের মধ্যে শীতঘুমে আচ্ছন্ন বহু র‍্যাটেল সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ, ইঁদুর, পেঁচা, কাঠবেড়ালী, কুকুর প্রভৃতি বহু প্রাণীকে আবিষ্কার করেছিলেন। এরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ে শত্রুতা ভুলে সহ-অবস্থানে ব্রতী হয়েছিল। এমন আশ্চর্যজনক ঘটনা খুবই বিরল।

আরও দেখা গেছে, খাদ্য যেখানে সহজলভ্য সেখানে খাদ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ জীবের মধ্যেও হিংসার পরিমাণ যথেষ্ট কম। খাদ্যের ঘাটতি না ঘটলে খাদ্য ও খাদক একসঙ্গে আজীবন কাটিয়ে দিতে পারে—এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। হিংসা তো দূরের কথা, সামান্য ঝগড়াঝাটি পর্যন্ত হয় না। বিশেষজ্ঞরা চিড়িয়াখানায় খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান এমন জীবগুলিকে শিশুকাল থেকে প্রতিপালন করেছেন এবং দেখেছেন, তারা উভয়েই আজীবন বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়।

বহু জনে খাদ্য ও খাদক প্রাণীদের নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন, পরিবেশের রদবদল করে বেড়ালের দ্বারা ইঁদুরকে প্রতিপালন করিয়েছেন, বাঘের বাচ্চার সঙ্গে গবাদি পশুদের বাচ্চাকে বড় করিয়েছেন, নেকড়ে, ভালুক, খাটাশ, শেয়াল, রেকুন, প্রভৃতির বাচ্চাকে একসঙ্গে প্রতিপালন করেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাল ফল পেয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায়, আমরা খাদ্য-খাদকের সম্পর্ককে প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে উল্লেখ করলেও তা সর্বাংশে সত্য নয়। তাঁদের মতে বিশেষ অবস্থাই প্রাণীদের শত্রু-ভাবাপন্ন করে তোলে। যদি খাদ্য-খাদকের মধ্যেও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় তাহলে উভয়ে বন্ধুত্বের ঋণ সারাজীবন স্বীকার করে থাকে।

জীব-জগতের এই অত্যাশ্চার্য বন্ধুত্ব সম্বন্ধে আরও গবেষণা করার আছে এবং এখনও প্রাণীতত্ত্ববিদরা গবেষণা করেও যাচ্ছেন। জানতে পারা গেছে, অনুন্নত মস্তিষ্ক হলেও পশুদেরও হৃদয় আছে। দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী কেবলমাত্র মানুষের একচেটিয়া নয়। এগুলি প্রাণী মাত্রেরই সহজাত গুণ। বরং মানুষই আপন স্বার্থের তাগিদে নিয়ম ভাঙ্গে তথা মনুষ্যত্ববোধ জলাঞ্জলি দিয়ে বন্ধুত্বের অমর্যাদা করে, প্রতিবেশীর প্রতি বিরূপ আচরণ করে এবং সমাজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

এ ভুল কিন্তু ইতর জীবজন্তুরা করে না। প্রাকৃতিক নিয়মকে তারা যথাযথ ভাবে পালন করে চলে। এককালে মানুষও যখন অরণ্যে বাস করতো, তখন তাদের মধ্যেও কোন স্বার্থ-চিন্তা ছিল না। পশুদের মতই ছিল শাসক-শোষকহীন এক সুন্দর ও সুখী সমাজ।

মানুষের প্রতি জীবজন্তুর ভালবাসা—মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সর্বগুণের অধিকারী। অবশ্য মানুষ অনেক সময় তার আচরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান করে না। তা হলেও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রতি আগ্রহ অধিকাংশ ইতর জীবজন্তুর। তারা অনুগত হতে চায় এবং বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমে মনে আসে সাগরের অন্যতম বাসিন্দা ডলফিনদের কথা। ওরা হয়ত জীবজন্তুদের মধ্যে একটু বেশী বুদ্ধিমান বলে মানুষের সান্নিধ্য ওদের ভারি পছন্দ। পোষ না মানলেও ওরা মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

স্থলভাগেরও বহু জীব মানুষের আনুগত্য স্বীকার করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। গরু, মহিষ, ঘোড়া, উট, কুকুর, বেড়াল, ছাগল, মেষ, হাস, মুরগী, বানর, এমনকি বনের বৃহত্তম জানোয়ার হাতীও সহজে মানুষের বশীভূত হয়ে পড়ে। কুকুর, বেড়াল, গরু, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিতদের ক্ষেত্রে যেন সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুকুরের বাচ্চা, বেড়ালের বাচ্চা এবং গোবৎসও একক থাকলে মানুষকে দেখলেই কাছে ছুটে আসে যেন করুণভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে। কুকুরের বাচ্চা আবার কখনও কখনও অব্যক্ত ভাষায় মানুষের পায়ের কাছে মুখ ঘষতে থাকে। মাতৃহীন গোবৎস, বেড়াল কিংবা কুকুর শাবক মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। আবার তাদের প্রতি যে একটু আদর করে কিংবা খেতে দেয় তাহলে তো কথাই নেই। সারাজীবন যেন ক্রীতদাস হয়ে থাকে। মহাকবির লেখনীতে শকুন্তলার প্রতি হরিণ শিশুর যে চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ফুটে উঠেছে, তা আদৌ অতিরঞ্জিত নয়।

পোষ না মানা পশুপাখীরাও মানুষের আদর বোঝে। আকাশে স্বাচ্ছন্দ্য

বিচরণকারী পাখীদের দৈনিক কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে খেতে দিলে তারা ঠিক সময়ে খাওয়ার জন্য ছুটে আসে এবং খেতে না পেলে চিৎকার জুড়ে দেয়। কাঠবেড়ালী-দেরও এমনটি করতে দেখা গেছে। বে-ওয়ারিস কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি দুটি খাওয়ার আশায় মানুষের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। দু-একবার কেউ দয়া করে খেতে দিলেই আর সে স্থান ত্যাগ করে না। চুপচাপ পড়ে থাকে। জোরে আঘাত করলেও আর্ত চিৎকারে চারদিক ভরিয়ে দেয় কিন্তু আক্রমণ করতে ছুটে আসে না।

বনের পশু-পাখীও মানুষের উপকার ভোলে না। এণ্ড্রোক্লিসের গল্পটি আদৌ কল্পনাপ্রসূত নয়। ক্রীতদাস এণ্ড্রোক্লিস প্রভুর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বনে পালিয়েছিলেন। সেখানে দেখলেন একটা সিংহ চুপচাপ বসে আছে। ভীত এণ্ড্রোক্লিস কি করবেন স্থির করতে পারছিলেন না। এমন সময় সিংহটি থাবা তুলে তাঁকে দেখালো। এণ্ড্রোক্লিস দেখলেন, সিংহের থাবায় একটি কাঁটা ফুটেছে। এণ্ড্রোক্লিস কি ভেবে ভয়ে ভয়ে সিংহের কাছে গিয়ে কাঁটাটি তুলে ফেললেন। সিংহ কিছু বলল না তাকে।

কিছুদিন পরে এণ্ড্রোক্লিস ধরা পড়লেন। তখন তাঁকে হত্যার জন্য সদ্য ধরা-পড়া এবং কয়েকদিন ধরে অভুক্ত রাখা এক সিংহের খাঁচায় ফেলে দেওয়া হল। এণ্ড্রোক্লিস চিনতে না পারলেও সিংহটি কিন্তু চিনে নিয়েছিল। একদিন যে উপকার সে পেয়েছিল সে কথা সে ভুলতে পারে নি। তাই এণ্ড্রোক্লিসকে দেখে কাছে এগিয়ে গিয়ে পোষা কুকুরের মত পায়ে মাথা ঘষে ঘষে আনুগত্য প্রকাশ করলো। এতদিন অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও এণ্ড্রোক্লিসের কোন ক্ষতি করল না।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে যে সব অভিযাত্রীদল গমন করেন, তারা দেখেছেন ক্যাসট্রেল পাখীরা যেন সব সময় তাঁদের ঘিরে থাকে। এঁদের পরিত্যক্ত খাদ্য তারা গ্রহণ করে এবং তাঁবুর অত্যন্ত কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। যখন অভিযাত্রীরা প্রত্যাবর্তন করেন তখন অনেকদূর পর্যন্ত ছুটে আসে। যেন বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে যায়।

যাযাবর অ্যালবাট্রাস পাখীরাও মানুষকে বড় ভালবাসে। সমুদ্রে জাহাজ দেখলেই তারা ছুটে আসে—যেন অভিনন্দন জানাতে আসে। তারপর এক নাগাড়ে অনুসরণ করে জাহাজকে। ঐ সময় জাহাজ বিপদে পড়লে তারা সামনে পথ দেখিয়ে জাহাজকে বিপন্মুখ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। অ্যালবাট্রাস সঙ্গ নিলে নাবিকরা মনে করেন তাঁদের যাত্রাপথ শুভ হবে। বিদেশে সমুদ্রপথের সঙ্গীকে নাবিকরা কিছু বলেন না।

জীবজগতের বিস্ময় পোকামাকড়

বেশীরভাগ পোকামাকড় তথা কীট পতঙ্গদের চেহারাটা এমন বিদঘুটে, চালচলন এমন বিশ্রী, শরীরের সঙ্গে পা, চোখ ইত্যাদি এমন বেমানান যে দেখলেই গা-টা ঘিন ঘিন করে উঠে। ওদের কেউ কেউ জীব ও উদ্ভিদদের প্রচণ্ড ক্ষতি করে, কেউ এত বিষাক্ত যে অসাবধানতাবশতঃ পেটে গেলে মৃত্যুও পর্যন্ত হতে পারে, কেউ বা নানা প্রকারের রোগ ছড়ায়। কারও কারও আবার এমন বিষাক্ত হুল কিংবা রোঁয়া থাকে যে গায়ে ফুটলে বিরাট বিরাট জন্তুজানোয়ার পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে পড়ে।

তবে সব পোকামাকড় এমনটি নয়। অনেকে জীব ও উদ্ভিদের নানা উপকার করে থাকে। বহু পোকামাকড় অপকারীদের সংহার করে, উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে সাহায্য করে, মানবসভ্যতার নানা উপকরণও যোগায়। তাই পোকামাকড়দের প্রতি বিজ্ঞানীদের ভারি উৎসাহ।

বিজ্ঞানীদের মতে প্রথম স্থলভাগ আত্মপ্রকাশ করলে ওরাই প্রথম বাসা বেঁধেছিল। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে আগমন হয়েছিল এদের। হয়ত এই কারণে পৃথিবীতে ওদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্রই ওদের দেখা যায়।

পৃথিবীতে যত প্রাণীর বাস তাদের মোট ২২টি পর্বে বা ফাইলামে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। ২২টি পর্বের মধ্যে মাত্র একটি পর্ব এককোষীদের এবং একটি পর্ব মেরুদণ্ডীদের। বাদ বাকি ২০টি পর্ব অমেরুদণ্ডীদের। পোকামাকড়রা ঐ অমেরু-দণ্ডীদের অন্তর্ভুক্ত। এবং এদের পর্বটিকে বলা হয় অর্থোপডা বা সন্ধিপদ প্রাণী। অপরদিকে ঐ সন্ধিপদ প্রাণীরাই অমেরুদণ্ডীদের সমস্ত পর্বকে ছাপিয়ে উপরে উঠেছে। আর দ্বিতীয় ঐ কারণটির জন্যও বিজ্ঞানীদের প্রখর দৃষ্টি কীটপতঙ্গের উপরে।

সন্ধিপদ প্রাণীদেরও বিজ্ঞানীরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে পড়ে চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি জলচররা, দ্বিতীয় ভাগে পতঙ্গ বা ষট্‌পদীরা, তৃতীয় ভাগে কেন্নো, বিছে প্রভৃতি বহুপদ প্রাণীরা এবং চতুর্থ ভাগে ধরা হয়েছে মাকড়সা, কাঁকড়া বিছে প্রভৃতিদের।

কীটপতঙ্গ মাত্রেই ত্রিস্তরযুক্ত দেহবিশিষ্ট। বহিঃত্বক কাইটিনযুক্ত কিউটিকল

দিয়ে গড়া। ওরা প্রত্যেকেই আবার দ্বিপার্শ্ব প্রতিসম খণ্ডীভবনযুক্ত। প্রতি দেহখণ্ডের সঙ্গে একজোড়া পার্শ্বীয় সন্ধিল উপাঙ্গ যুক্ত থাকে। পেশীগুলিও খণ্ডাকারে সজ্জিত। পৃষ্ঠীয় হৃৎপিণ্ড এবং ধমনী আছে কিন্তু রক্ত জালক নেই। ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী অথবা বুকলাংসের সাহায্যে শ্বসন সম্পন্ন করে। ওদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে।

পতঙ্গদের শরীরের আবরণটি কিন্তু ভারি অদ্ভুত। আবরণটি অত্যন্ত হালকা অথচ সুদৃঢ় ও নমনীয়। অপরদিকে দেহাবরণ নমনীয় হওয়া সত্ত্বেও বাহিরের কোন রাসায়নিক বস্তুর সংস্পর্শে এলেও সহজে গলে যায় না। আমরা আমাদের চারপাশে রঙ-বেরঙের যে সব পতঙ্গ দেখি তাদের দেহে আবার ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনেড প্রভৃতি নানারকম রাসায়নিক পদার্থ থাকে।

যে-কোন কীট ও পতঙ্গদের দেহ তিন ভাগে বিভক্ত থাকে। মাথা, ধড় ও পেট। মাথার দুপাশে থাকে দুটি অ্যানটেনা বা শুঁড়। প্রত্যেকেরই শুঁড় অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন। সামান্য একটু স্পর্শেই তারা বুঝে নেয় কোন্‌টি কি জিনিস। আরও মজার কথা, ওদের শুঁড়টা যেন বেতার গ্রাহক যন্ত্র ও প্রেরক যন্ত্র—এই উভয়ের সমন্বয়। আমরা যেমন বেতার-প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে বাহক বেতার তরঙ্গের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করে থাকি এবং বেতার গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে সেই সংবাদকে সংগ্রহ করে নি, তেমনি ওদের ঐ অ্যানটেনাদ্বয় অনেকটা এইভাবেই সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে থাকে। আরও আশ্চর্য! ঐ শুঁড় জোড়ার মাধ্যমেই তারা আপন চাহিদার অধিকাংশই পূরণ করে নেয়।

কীটপতঙ্গদের চোখও কম বিস্ময়কর নয়। অপরাপর জীবজন্তুর মত তাদের মাথায় কেবলমাত্র একজোড়া চোখ থাকে না, বহু চোখের সমষ্টি বা পুঞ্জাক্ষি থাকে। কারও কারও মাথায় দশ হাজার জোড়া চোখ থাকতেও দেখা গেছে।

কীটপতঙ্গের রাজ্যের খবর রূপকথার গল্পের মত আশ্চর্যজনক ও রোমাঞ্চকর। জীবজন্তুর মত ওদের গায়ে রক্ত নেই। অথচ দুটি ফুসফুস। ট্রেকিয়া নামে বিশেষ এক ধরণের কৈশিক নল দিয়ে ওদের দেহের কোষে কোষে অক্সিজেন সঞ্চারিত হয়। ঐ ট্রেকিয়া থাকার জন্য ওদের পেশীতে প্রচণ্ড শক্তি। যেখানে একজন মানুষ নিজের ওজনের সমান ওজন বহন করতে হিমসিম খেয়ে যায় সেখানে অনেক পোকামাকড় নিজের দেহের তুলনায় বহুগুণ ওজন বহন করতে সক্ষম হয়। দেখা গেছে, স্ট্যাগহর্ন বিট্‌ল নামে এক ধরণের পতঙ্গ নিজ দেহের ওজনের প্রায় ৯০ গুণ বোঝা বহন করতে পারে। এদের চেয়ে শক্তিমান পোকামাকড়ের মধ্যে আর কেউ নয়।

পোকামাকড়রা লাফাতেও ভয়ানক ওস্তাদ। গঙ্গাফড়িং এক লাফে ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি তথা নিজ দেহের ১০০ গুণের মত দূরত্ব অতিক্রম করে। ফ্লিয়ার নামে এক ধরণের পতঙ্গের পায়ের দৈর্ঘ্য কয়েক মিলিমিটার। অথচ সে লং জাম্প দেয় ৩০ সেন্টিমিটার এবং হাই জাম্প দেয় ২০ সেন্টিমিটার। গঙ্গাফড়িং ও ফ্লিয়ারই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে লং জাম্প ও হাই জাম্পে ওস্তাদ।

আমাদের জানা চেনাদের মধ্যে প্রথমে পিঁপড়েদের কথা উল্লেখ করতে হয়। পিঁপড়েরা ভয়ানক সামাজিক ও একতাবদ্ধ জীব। নিজের দলে কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে না। জীবজগতের মধ্যে আবার সবচেয়ে পরিশ্রমী এরা। সঞ্চয়শীলও এদের মত কেউ নয়। ওদের বাসা নির্মাণ পদ্ধতি থেকে আচার ব্যবহার সবই বিচিত্র ধরণের। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, ওরা নিজেদের সুবিধার জন্য নানারকম জীবকে প্রতিপালন করে এবং চাষবাস করে। আমরা আর কত রকমের গৃহপালিত পশু রাখি! কিন্তু পিঁপড়েরা পালন করে প্রায় ৬০০ রকম জীবকে। যাদের তারা পোষে—তাদের কিছু কিছুকে বলা হয় পিঁপড়েদের গরু। পিঁপড়েদের সেই সব গরুর দেহে থাকে এক রকমের মিষ্টি রস। পিঁপড়েরা ওদের দেহ কামড়ে সুস্বাদু রস পান করে। পিঁপড়েরা ভারি সৌখিনও বটে। তাই সুগন্ধির জন্যও পালন করে হরেক রকম জীব। অন্যদিকে সেইসব জীবদের দেখা শোনা করার জন্য রাখালও পোষে। তারপর চাষবাস! সেও ভারি মজার কিন্তু। তবে আমাদের মত লাঙ্গল দিয়ে জমিকে চষে না। বর্ষার প্রারম্ভে তাদের বাসার সামনে নানারকমের ছত্রাক ইত্যাদির বীজ ছড়িয়ে দেয়।

পিঁপড়েদের আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা আগে থেকে ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের টের পেয়ে থাকে। আমরা যা পূর্বাহ্নে জ্ঞাত হওয়ার জন্য কত রকমের যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করে থাকি! অথচ তারা বিনা যন্ত্রেই টের পেয়ে যায়। ঝড়ের পূর্বেই তারা ডিম প্রভৃতিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। যে-সব অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়, সে-সব অঞ্চলের কিছু কিছু কীটপতঙ্গ আবার আগে থেকে টের পায়। সত্যিই বড় অদ্ভুত ক্ষমতা এদের।

বোলতা, উইপোকা, ভিমরুল, মৌমাছি—ওরাও সামাজিক জীব। তবে পিঁপড়েদের মত কেউ নয়। জীব পালন এবং চাষবাসও কেউ করতে পারে না। তবে ঐ সামাজিক জীবদের দলে তথা বাসায় পুরুষ, রাণী ও শ্রমিক তিন ধরণের প্রাণী থাকে। পুরুষেরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়, রাণী কেবল ডিম পাড়ে এবং হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে শ্রমিকেরা। তাই বলে শ্রমিকেরা কখনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না। আরও একটি মজার কথা, ওদের এক-একটি রাণী সারাজীবনে কোটি খানেকের মত ডিম পাড়ে। একটি রাণী-মৌমাছি ডিম পাড়ে দৈনিক এক

হাজারেরও বেশী। রাণী-উই আবার সবার উপরে টেক্কা দেয়। সারা জীবনে প্রায় দেড় কোটির মত ডিম পাড়ে। পশু-পাখীর জগতে এটি একটি রেকর্ড।

পতঙ্গরা ওড়ার সময় এত অধিক সংখ্যক বার ডানা কাঁপায় যে ভাবতেও যেন অবাক লাগে। ওদের মধ্যে মাছিরাই রেকর্ড স্থাপন করেছে। কোসিপোমিয়া নামের মাছি এক সেকেণ্ডে ডানা কাঁপায় ১০৪১ বার। সেফেনিমা নামের এক জাতীয় মাছি আবার দ্রুত উড়তে পারে। এত দ্রুত যে, মানুষের তৈরি এরোপ্লেনও হার মানে ওদের কাছে।

পোকামাকড়দের দেহে বড় অদ্ভুত অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি যুক্ত থাকে। মৌমাছিদের জিভে থাকে হুবহু বুরুশের মত একটি জিনিস। মাকড়সার পায়ের তলদেশ চিরুণীর মত, গঙ্গা ফড়িংদের পায়ে শক্ত জিনিস ভাঙ্গার কল, কুমরে পোকার দেহে থাকে ড্রিলের ব্যবস্থা, এমনই আরও কতজনের দেহে কত রকমের ব্যবস্থা আছে।

আরও জানা ,গেছে, কর্মী মৌমাছিরা নানা রকমের অর্থবহ সঙ্কেতের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে খবর আদান-প্রদান করে। অনেকের বিশ্বাস পিঁপড়েরাও এমনটি করে থাকে।

আশ্চর্য এই ক্ষুদে কীটপতঙ্গের জগৎ আর আশ্চর্য তাদের ক্ষমতা!

জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গদের ঘরবাড়ী

মানুষ কার্যশেষে বিশ্রামের জন্য, রুগ্ন ও অসমর্থদের পরিচর্যার জন্য, সন্তান প্রতিপালনের জন্য, শীত-গ্রীষ্ম এবং রোদ-জল থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য স্থায়ীভাবে ঘর বানায়। মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই না হলে আমাদের চলে না। অথচ এই বুদ্ধিমান মানুষ জাতটা প্রকৃত ঘর বাঁধতে শিখেছে মাত্র হাজার দশেক বছর আগে। কিন্তু এমন যে নিকৃষ্ট জীব পোকামাকড়—তাদের ঘর বাঁধাটা যেন জন্মগত অভ্যাস। তাদের ঘর বাঁধার মধ্যে কারিগরী দক্ষতাও বড় কম নেই।

অরণ্যের বাসিন্দা বড় বড় জন্তুজানোয়াররা কিন্তু ঘর বাঁধতে জানে না বা ঘর বাঁধায় প্রবণতাও তাদের আদৌ নেই। ঘর বাঁধার প্রবণতা মানুষ ছাড়া কেবল মাত্র কয়েক রকমের পাখী, সামান্য কয়েকটি ইতর জন্তু ও কীটপতঙ্গের মধ্যেই দেখা যায়।

চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে স্থায়ী আবাস তৈরি করে খেঁকশিয়াল, খরগোস, ইঁদুর প্রভৃতি কয়েক জাতের প্রাণী। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য গর্তে থাকে বেশ কয়েকটি মুখ। বাচ্চা দেওয়ার সময় সদ্যোজাত বাচ্চার গায়ে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য গর্তের ভেতরে লতা-পাতা ঘাস-খড় ইত্যাদি দিয়ে

গদির মত করে নেয়। ওদের কারিগরী দক্ষতা বিশেষ দেখা যায় না। কিছুটা যেন নৈপুন্য দেখা যায় ইঁদুরদের বাসার মধ্যে। ফসলের ক্ষেতে, বড় গাছে, ঘরের আসবাবপত্রের ভেতরে মানুষের পরিত্যক্ত জিনিস কিংবা উদ্ভিদের দেহাংশকে কেটে কেটে একেবারে তুলোর গদির মত করে নেয়। সেইখানে তারা বাচ্চা দেয়, বাচ্চাকে বড় করায় ইত্যাদি। কাঠবেড়ালীরাও কতকটা এই ধরণের বাসা তৈরি করে।

গৃহ নির্মাণে দক্ষ কারিগর কিছু কিছু পাখী। অতি ক্ষুদ্র যে হার্মিং বার্ড—তারাও গাছের ডালে শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি করে চমৎকার পান পাত্রের মত বাসা। সেই বাসাকে আবার আচ্ছাদিত করে সবুজ লাইকেন দিয়ে। গাছের পাতার সঙ্গে বাসাটি এমন বেমালুমভাবে মিশে যায় যে দূর থেকে ঠাওর করা যায় না। লাইকেনের আস্তরণ থাকার জন্য বাসায় জল প্রবেশ করারও ভয় দূর হয়।

ছোট ছোট ঝোপেঝাড়ে টুনটুনিরাও যে বাসা বানায় তাও কম অদ্ভুত নয়। সবুজ লতাকে জোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরি করে খাসা একখানা ঘর। তার ভেতরে গদির মতও করে থাকে। কাঁচা পাতা শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত টের পাওয়া যায় না তাদের বাসার অবস্থিতির কথা। টুনটুনিদের বাসাও জল নিরোধক এবং একপাশে যাওয়া আসা করার জন্য থাকে ছোট্ট একটি মুখ।

আমাদের দেশের বাবুই পাখীরাই ঘর বানানোর ব্যাপারে এক ওস্তাদ কারিগর। খেজুর, তাল কিংবা নারিকেল গাছের পাতাকে খুব সরু সরু করে ছিঁড়ে চমৎকার বুনন দিয়ে তালগাছে বাসা বানায়। ঘর বানানোর ব্যাপারে তারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার কোন তুলনাই যেন হয় না। একেবারে জল নিরোধক বাসা ও একাধিক কুঠুরিযুক্ত। সৌখিনও বেশ। একটুখানি কাদামাটি এনে রেখে দেয় বাসার এক কোণে। রাত হলে জোনাকি পোকাকে এনে গুঁজে দেয় ঐ কাদায়। শয়ন কক্ষে সবুজ বাল্ব থেকে বিজলী আলো এলে যেমনটি হয় ঠিক তেমনটি যেন। বাসাটি আবার এত শক্ত ও মজবুত করে গড়ে থাকে যে ঝড়-বাতাসে ছিঁড়ে পড়ে না। কুঠুরীর ভেতরে নরম গদিও রাখে।

ভিরিওল নামে এক ধরণের পাখীর বাসাও কম সুন্দর নয়। গাছের ডাল যেখানে ইংরাজী Y-অক্ষরের মত হয়ে গেছে সেই জায়গাটিকেই ওরা বাসা তৈরির জন্য পছন্দ করে। চমৎকারভাবে বাসাটা ঝুলিয়ে দেয় নিচের দিকে।

পাখীদের বাসা নির্মাণের ক্ষেত্রে টেক্কা দিতে পারে ওরিয়ল নামের এক ধরণের পাখী। এদের বাসা নয়ত—যেন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি কক্ষ। প্রবহমান জলধারার কাছে, পাথরের খাঁজে শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি করে গোলাকার বাসা। তার উপরে আবার শেওলার প্রলেপ দেয়। শেওলাপড়া পাথরের সঙ্গে বাসাটা মিলে মিশে একেবারে একাকার হয়ে যায়।

এমনিতে পাখীদের আচার আচরণ ভারি অদ্ভুত। ডিম দেওয়ার সময় হলেই তারা অনেকে অনেক রকমের বাসা তৈরি করে। মানুষের বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুঘু, চড়ুই, দোয়েল প্রভৃতি পাখীরা, গাছের মগডালে শালিক, চিল, কাক, শকুন প্রভৃতি যে সব বাসা খাড়া করে তার মধ্যে তেমন কারিগরী দক্ষতা দেখা যায় না। টিয়া, নীলকণ্ঠ, দোয়েল প্রভৃতি পাখীরা গাছের কোটরই অধিক পছন্দ করে। মাছরাঙারা পুকুরের পাড়ে গর্তকে বেছে নেয়। এরা কেউ ঠিক কারিগর নয়।

পাখীদের চেয়ে কীটপতঙ্গরাই ঘর বাঁধায় অধিক দক্ষ মনে হয়। পতঙ্গদের মধ্যে মৌমাছি, বোলতা, নানারকমের ভ্রমর, ভীমরুল প্রভৃতি আমাদের অতি পরিচিতদের কথা মনে পড়ে। ভীমরুলরা কাদামাটি দিয়ে গাছের গুঁড়িতে, ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁকে, ঝোপে-ঝাড়ে বাসা বানায়। বাসার উপরটা অত্যন্ত মসৃণ। মুখের লালা দিয়ে এমন এক প্রলেপ দেয় যাতে মাটির তৈরি হলেও বৃষ্টির জলে ধুয়ে যেতে পারে না। চাক অনেকটা উল্টে দেওয়া মেটে রঙের কলসীর মত দেখতে লাগে। সেই চাকের মধ্যে নানা প্রকোষ্ঠ বানায় এবং বাহিরে বেরুবার জন্য মাত্র দু তিনটি ফুটো রাখে।

ভোমরাদের বাসা তৈরিও বেশ সুন্দর। নরম কাঠ, বাঁশ, ঘুণধরা কাঠ ইত্যাদির মধ্যে প্রথমে তারা গর্ত তৈরি করে। তারপর গাছের পাতাকে চারপাশ কেটে গোল চাকতির মত বানায়। সেই চাকতিগুলিকে গর্তের মধ্যে পরপর সাজিয়ে এবং মুখের আঠা নিয়ে জুড়ে দিয়ে এক একটি প্রকোষ্ঠ তৈরি করে এবং তাতেই ডিম পাড়ে। গর্তের মধ্যে তাদের ঘর তিন থেকে চার ইঞ্চি লম্বা এবং বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা একটা সবুজ দণ্ডের মত দেখায়।

সবচেয়ে সুন্দর মৌমাছিদের চাক। বোলতারা অবশ্য চাক বানায়। তাহলেও বোলতাদের চাক মৌমাছিদের মত এত সুন্দর নয়। বোলতাদের চাক একটা বড় কেকের মত। চাকের উপরে জল নিরোধকের ব্যবস্থা থাকে। তলার দিকে ছোট ছোট কুঠুরি তৈরি করে। সেই কুঠুরিগুলিতে ডিম পাড়ে। পুত্তলী অবস্থায় কুঠুরির মুখ বন্ধ করে নেয় তারপর পূর্ণাঙ্গ বোলতা মুখ কেটে বেরিয়ে আসে।

মৌমাছিদেরও চাকে অসংখ্য কুঠুরি থাকে। প্রতিটি কুঠুরি ছ কোণা। কুঠুরিগুলির মুখ একটা সুষম ষড়ভুজের মত দেখায়। কুঠুরিগুলিকে ওরা শুধু ডিম পাড়ার কাজে ব্যবহার করে না—মধু, পরাগ ইত্যাদিকেও সঞ্চয় করে রাখে। গাছের কোটরে, দেওয়ালের ফাঁকে, অথবা গাছের ডালে একটু নির্জন জায়গায় ওরা চাক তৈরি করে। ভারী সঞ্চয়শালী ওরা।

আমাদের চারদিকে যে সব কাঁটা পোকা ও ঝুড়ি পোকাদের দেখা যায়, তারা ছোট অবস্থায় এক একটি দক্ষ কারিগর। কাঁটা পোকাদের গায়ে থাকে অজস্র কাঁটা। ওরা গাছের ছালকে কুরে কুরে বাসা তৈরি করে। খুব বেশী ভেতরে যায় না। গায়ের লাল রঙের কাঁটাগুলো বাহির থেকে বেশ ভালভাবেই ধরা পড়ে। ছালকে একটু নষ্ট করার জন্য গাছের সামান্য ক্ষতি হলেও বড় বড় শত্রুর হাত থেকে গাছ রক্ষা পায়।

কাঁটা পোকারা গাছের ছাল খেয়ে খেয়ে পুষ্ট হয় এবং একদিন দেহের চারদিকে সুন্দর একটা গুটি তৈরি করে নেয়। অবশেষে গুটি কেটে পূর্ণাঙ্গ এক কাঁটা পোকা রূপে বেরিয়ে আসে।

রেশম মথ ও নানা রকমের প্রজাপতিও শুক অবস্থায় দেহের চারদিকে গুটি তৈরি করে পুত্তলীতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় নিজের চারদিকে যে আবরণ তথা সুন্দর জল নিরোধক বাসা তৈরি করে নেয় তাও কম দক্ষতাপূর্ণ নয়। আশ্চর্য সুন্দর সেই ঘর। অথচ মুখের লালা দিয়েই তারা তৈরি করে।

অনেকটা শুঁয়া পোকার মতন দেখতে বিভিন্ন জাতের ঝুড়ি পোকাও দেখা যায়। কোন কোন প্রজাতির ঝুড়ি পোকা দুর্বাঘাসকে কেটে টুকরো টুকরো করে বাসার উপরে প্রলেপও দিয়ে থাকে। আর সেই বাসাটিকে যেখানে যায় সেখানে বহন করেও নিয়ে যায়। যে সব ঝুড়ি পোকা জলে বাস করে তারা জলের ধারে উদ্ভিদের দুটি পাতাকে নিয়ে গোল করে সুন্দরভাবে কেটে মুখ নিঃসৃত একপ্রকার আঠালো পদার্থের দ্বারা জুড়ে নেয়। ফলে ভেতরে জল ঢুকতে পারে না। উপরের দিকে থাকে একটা ছোট্ট মুখ। আর তার ভেতরে বসে থেকে দিব্যি ভেলায় চড়ে ভেসে বেড়ানোর মত ঘোরা ফেরা করে।

বর্ষাকালে পাট গাছে এবং অন্যান্য ঝোপে ঝাড়ে সাদা থুথুর মত জিনিস দেখা যায়। এগুলি কিন্তু এক জাতীয় ছোট ছোট পোকার বাচ্চার ঘর। ঐ থুথুর ভেতরেই তারা বাস করে। তাই তাদের নাম থুথু পোকা।

ক্লাডিস ফ্লাই নামের কয়েক জাতের পতঙ্গ আছে। এরা শামুকের মত কুণ্ডলী পাকানো ঘর তৈরি করে। কেউ কেউ বা ঘর বানায় নলের আকারে। আর গুবরে পোকারা অবিকল টুনটুনির মত বাসা খাড়া করে।

কয়েক রকমের পতঙ্গ শুক অবস্থা থেকে যখন পুত্তলীতে পরিণত হয় তখন নিজের চারদিকে যে গুটি প্রস্তুত করে তা অনেকটা কালো ঝুলের মত দেখায়। সাধারণতঃ ওরা রান্নাঘরেই বাসা বাঁধে। তাই ভালভাবে না দেখলে ওদের বাসা ঠিক ঠিক ধরা যায় না। আর এক ধরণের পতঙ্গ ছোট ছোট গাছের ডগায় সরু সরু তিনখানা কিম্বা চারখানা শুকনো ডালকে একসঙ্গে জুড়ে ঘর বানায়। ভেতরে থাকে

নলের মত। তারই মধ্যে দিব্যি লুকিয়ে থাকে। দেখলে মনে হয় ডগায় শুকনো ডাল ঝুলছে।

কোন কোন জাতের পোকা মাছের আঁশ, ডিমের খোসা, পালকের টুকরা ইত্যাদি নিয়ে চমৎকার ঘর বানায় এবং সে ঘর সঙ্গে নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। শত্রুর গন্ধ পেলে সটান লুকিয়ে পড়ে বাসার মধ্যে। এই অবস্থায় এক টুকরো আবর্জনা বলেই ভ্রম হয় আমাদের।

বাসা নির্মাণে সুদক্ষ কারিগর পিঁপড়ে ও উইপোকা। কোন কোন জাতের উইপোকা মাটির ভেতরে চমৎকার চমৎকার সব কুঠুরি তৈরী করে ঘর বানায়। আর এক জাতের উইপোকা গাছের গুঁড়ি ইত্যাদিকে অবলম্বন করে বেশ উঁচু এবং দেখতে ঠাকুর দেবতার মূর্তির মত সুন্দর ঢিবি তৈরি করে। পিঁপড়েদের তো কথাই নেই। তারা মাটির ভেতরে মস্ত বড় জায়গাকে ঘিরে আস্তানা খাড়া করে। নানা প্রকারের কুঠুরিও থাকে সেখানে এবং সেগুলিকে তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করে। ছাপোষা চাষা তো! কত সরঞ্জাম তাদের মজুত করতে হয়? এক জাতের লাল পিঁপড়ে আবার গাছের পাতাকে মুখের লালা দিয়ে জুড়ে জুড়ে বলের মত ঘর বানায়। তার ভেতরেও পাতাকে জোড়া দিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ তৈরি করে।

মাকড়সারাও দক্ষ কারিগর। তাদের জালকেও তাদের ঘর বলা যেতে পারে। বর্ষায় ভেজে না, হঠাৎ ছিঁড়েও যায় না। জালের মাঝখানে বা পাশে ঘন বুনন দিয়ে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং চুপচাপ বসে থাকে। কোন কোন জাতের মাকড়সা দেওয়ালের ফাঁকে, গাছের কোটরে ও পাতার আড়ালে বাসা তৈরি করে। অনেক মাকড়সা আবার গর্ত তৈরি করে এবং গর্তের মুখে জাল খাটিয়ে বাস করে থাকে। যে সব মাকড়সা জলে বাস করে, তারা জলের তলায়ও বাসা তৈরি করতে পারে।

গর্তবাসী ও জলের মাকড়সাদের বাসা তৈরিতে যথেষ্ট উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। গর্তবাসী অ্যাটিপাস মাকড়সারা গর্তের ভেতরে বালি এবং দেহ নিঃসৃত আঠালো সুতো দিয়ে প্রলেপ দেয় এবং উপরে ও নিচে থাকে পাতলা সুতোর ঘন জাল। জল ঢুকতে পারে না এবং ঘরখানাও বেশ ঝকঝকে সুন্দর হয়। যেন বালি সিমেন্ট দিয়ে দেওয়ালগুলোকে মেজে দেয়।

গর্তবাসী ট্রাপডোর মাকড়সারা ভয়ানক চতুর। ওদের গর্তের অনেকগুলি সুড়ঙ্গ থাকে। প্রতিটি সুড়ঙ্গের মুখে থাকে ঢাকনা এবং শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ঢাকনার উপর ছোট ছোট পাতা কিম্বা শুকনো ডাল-পালাকে সাজিয়ে রাখে। পোকামাকড় ভুল করে ঢুকলে আর রক্ষে নেই। তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একেবারে কাবু করে ফেলে।

জলাশয়ের মাকড়সারা জলাশয়ের অল্প গভীরে দেহনিঃসৃত সূতোর সাহায্যে চমৎকার এক খোলসের মত জিনিস তৈরি করে নেয়। এই খোলসটিকে আটকে দেয় জলজ কোন উদ্ভিদের ডালে। কেবল তাই নয়, বাহির থেকে বাতাস এনে খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে খোলসটি ছোট ছোট একটা তাঁবুতে পরিণত হয়।

আরও এমনই কত কীট পতঙ্গ আছে, যাদের ঘর বাড়ী দেখলে বিস্মিত হতে হয়। অথচ ঘর-বাঁধা তাদের কারও কাছ থেকে শিক্ষা করতে হয় না। ঘর-বাঁধাটা একেবারে প্রকৃতিগত।

নিশাচর প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তি

যে সমস্ত প্রাণী অন্ধকারেও সবকিছুকে দেখতে পায় এবং স্বচ্ছন্দ্যভাবে বিচরণ করার ক্ষমতা রাখে তাদের আমরা নিশাচর জীব বলি। নিশাচরদের সংখ্যা পৃথিবীতে কিন্তু অল্প নয়। নানাপ্রকার পোকামাকড় থেকে আরম্ভ করে সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, বেড়াল, বন-বেড়াল, শেয়াল, কুকুর, গরু, মহিষ, বাদুড়, পেঁচা প্রভৃতি কত প্রাণীকে আমরা রাতে ঘুরে বেড়াতে দেখি। এমনকি অতি ক্ষুদ্র মশারাও নিশাচরদের অন্ততম।

অপরদিকে বন্যপ্রাণীরা প্রায় সবাই নিশাচর। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি দিনের বেলায় যে-কোন একটি আস্তানায় পড়ে থাকে এবং রাত হলে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ ওদের কাছে রাতটা আমাদের দিনের মত।

অন্ধকার রাত আমাদের আতঙ্ক বিশেষ। রাতে আমরা কোন কিছুকে ভালভাবে চিনতে পারি না, দড়িকেও সর্পভ্রম হয়। দূরের ছোট ছোট ঝোপঝাড়কে দেখলে ভূতের ভয়ে শিউরে উঠি। কিন্তু নিশাচর প্রাণীদের আদৌ অসুবিধা হয় না। সূচীভেদ্য অন্ধকারেও তারা অতি দূর থেকে কোন বস্তুকে দিনের আলোয় দেখার মত পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। নিশাচরদের এই বৈশিষ্ট্য তাই আমাদের কাছে একটা বড় বিস্ময়। বহু বিজ্ঞানী ওদের সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দিবাচর প্রাণীদের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত তথ্য তাঁরা আহরণ করেছেন নিশাচরদের বেলায় এত তথ্য লাভ করতে পারেননি।

বিভিন্ন সময়ের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, রাতের প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তির প্রধান সহায়ক তাদের অক্ষিপটে রড্ নামক স্নায়ু কোষগুলির আধিক্য। যে কোন জীবের অক্ষিপটে থাকে রড্ ও কোণ নামক দু-ধরনের স্নায়ুকোষ। কোণকোষগুলি

কেবলমাত্র উজ্জল আলোতে সাড়া দেয় এবং রড্‌কোষগুলি সাড়া দেয় মৃদু আলোতে। সাড়া দেওয়া বলতে দৃশ্যবস্তু সম্বন্ধে স্নায়ুকোষগুলির মাধ্যমে মস্তিষ্কের অনুভূতি।

কিন্তু সব জীবদের অক্ষিপটে সমান সমান সংখ্যক রড্‌ ও কোণকোষ থাকে না। কারও থাকে রড্‌কোষ বেশী আবার কারও কোণকোষ। যাদের অক্ষিপটে কোণকোষের আধিক্য থাকে এবং তুলনামূলকভাবে রড্‌কোষ কম থাকে তারা দিনের বেলায় ভাল দেখতে পায়। কিন্তু যাদের রড্‌কোষের পরিমাণ বেশী থাকে তারাই রাতের বেলায় ভাল দেখার ক্ষমতা রাখে। অপরদিকে দু-ধরনের কোষের যদি কারও আধিক্য থাকে তাহলে দিনে ও রাতে সর্ব অবস্থায় তারা দেখার অসুবিধা অনুভব করে না।

সব নিশাচরদের দৃষ্টি একমাত্র রড্‌কোষের আধিক্যের জন্য নয়। অন্য কারণও আছে। দেখা গেছে, কুকুর, বেড়াল, গবাদি পশু প্রভৃতি কতকগুলো প্রাণীর অক্ষিপটের পেছনে থাকে এক ধরণের পর্দা। পর্দাটির এমনই বৈশিষ্ট্য যে, অক্ষিপটে যে-সব আলোকরশ্মি শোষিত হয় না সেগুলি পেছনের ঐ পর্দাটিতে এসে পড়ে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ধরা দেয় অক্ষিপটে। অর্থাৎ ঐ পর্দাটি থাকার জন্য কোন আলো অপচয় হতে পারে না। সবটুকুই কাজে লেগে যায়। ফলে অতি মৃদু আলোতেও তারা ভালভাবে দেখতে পায়। অপরদিকে ওদের অক্ষিপটে রড্‌কোষেরও আধিক্য থাকে। ঐ পর্দা থাকার জন্য অন্ধকারে বেড়াল প্রভৃতি প্রাণীর চোখদুটোকে জলজল করতে দেখা যায়। কুকুরা আবার দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা ঘ্রাণশক্তিকে কাজে লাগায় বেশী।

নিশাচর বাদুড় সম্বন্ধে কিন্তু উপরোক্ত কথাগুলি প্রযোজ্য নয়। বাদুড়দের দৃষ্টিশক্তি দিনে কিংবা রাতে কোন অবস্থাতেই তেমন কার্যকরী হয় না। অতি ক্ষীণদৃষ্টি। সেই দৃষ্টিশক্তিকে তারা কাজে লাগায় কিনা তাও সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করতে গিয়ে বাদুড়দের চোখ বেঁধে ছেড়ে দিয়ে দেখেছেন, চোখবাঁধা অবস্থায়ও বাদুড় ঠিক পথে উড়ে যেতে সমর্থ হয় এবং এই অবস্থায় খাদ্য সংগ্রহ করতেও অসুবিধা বোধ করে না।

বাদুড়দের ঐ আশ্চর্য ক্ষমতার মূলে দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা অন্য কোন বিশেষ শক্তি যে কাজ করে থাকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে এই শক্তি তাদের দ্বারা সৃষ্ট শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি গ্রহণ করার আশ্চর্যজনক ক্ষমতা।

শব্দের ধর্ম হচ্ছে, কোন উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ দূরের (কমপক্ষে ৫৫ ফুট) কোন প্রতিফলকে বাধাপ্রাপ্ত হলে ফিরে আসে। অনুরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসাকে বলে প্রতিধ্বনি। সাধারণত পাহাড়-পর্বত, বনভূমি অথবা বৃক্ষশ্রেণী,

ঘরের দেওয়াল ইত্যাদিতে শব্দ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। বাদুড় যখন উড়তে থাকে তখন মুখে একরকম শব্দ করে। সে শব্দ আবার সাধারণের শ্রুতি-গোচর হয় না। এর কম্পাঙ্ক বেশী এবং বলা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গ। বাদুড় কর্তৃক সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ কোন প্রতিফলককে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে এলে বাদুড়ের সর্বাধিক অনুভূতি-সম্পন্ন দেহের তুলনায় যথেষ্ট বড় কানগুলিতে ধরা পড়ে। সেই থেকে তারা নির্ভুলভাবে তাদের খাদ্যের উপস্থিতি এবং তা কতদূরে অবস্থিত, অতি সহজে নির্ণয় করে নেয় আর যথাস্থানে উড়েও যায়। তিমি, ডলফিন প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণী এবং কিছু কিছু পোকামাকড়ের অনুরূপ ক্ষমতা থাকলেও বাদুড়ের মত কারও নয়। ফলে বাদুড় চোখ বন্ধ করেও ঠিক পথে চালিত হতে পারে।

অন্ধকারের আর এক আশ্চর্য জীব পেঁচা। পেঁচাদের অক্ষিপটে অবশ্য রড্-কোষের আধিক্য রয়েছে। তাই অন্ধকারে ওরা ভালভাবেই দেখতে পায়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি যতই তীব্র হোক না কেন অতি দূরের জিনিসকে দেখা সম্ভব হয়ে উঠে না। কিন্তু পেঁচা বহুদূরের শিকারকে অতি সহজভাবে পাকড়াও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিকার খোঁজার কাজে বাদুড়দের মত পেঁচারা শব্দ-তরঙ্গকে ব্যবহার করে না। পেঁচাদের হাতিয়ার তার অদ্ভুত শ্রবণশক্তি।

প্রাণীতত্ত্ববিদদের মতে পেঁচার মাথাটা বড় হওয়ার জন্য দুপাশে যে কানদুটো থাকে তার দূরত্ব অন্যান্য পশুপাখীদের তুলনায় যথেষ্ট বেশী। দূরে শিকারের কাছ থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ শব্দ দুটি কানে ধরা পড়লেও শিকারের দিকে যে কানটি থাকে তাতে যে সময় ধরা পড়ে অপর কানটিতে ধরা পড়ে একটু পরে। যদিও সময়ের ব্যবধানটা অতি সূক্ষ্ম তবুও তারা ঐ সূক্ষ্ম ব্যবধানকে বেশ ভালভাবে ধরে ফেলতে পারে এবং দূরত্ব ঠিক করে নিয়ে উড়ে যায় শিকারের কাছে।

অন্ধকারের বিস্ময় জোনাকি

অন্ধকারের একটা রোমাঞ্চ আছে। দিনের আলোয় বস্তুমাত্রকেই আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। আঁধারের আড়ালে আত্মগোপনকারী বৃক্ষলতা, পশুপাখী প্রভৃতি সবাইকে যেন কোন এক কল্পলোকের বাসিন্দা বলে মনে হয়। তার উপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুক চিরে কোথাও কোন ক্ষীণ আলোর দীপ্তি যদি প্রকাশ পায় তাহলে তো কথাই নেই। যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে পুলকিত হতে হয়।

অন্ধকারে মনুষ্যসৃষ্ট আলোক অবশ্য ততখানি শিহরণ জাগায় না যতখানি জাগায় আমাদের চারপাশে জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গদের দেহ নিঃসৃত আলো। প্রকৃতির যেন এক একটি বিস্ময় এরা। দিনের আলোয় ওদের দেখলে কিচ্ছুটি মনে হয় না।

কিন্তু অন্ধকার ঘনীভূত হলে মুখে নীল আলো জেলে যখন খেঁকশিয়ালরা ছুটাছুটি করে তখন মনে হয় দলে দলে অশরীরী মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় যেন চষে বেড়াচ্ছে। কোন কোন সাপ ও বিছেকেও রাতে নীলাভ আলোর দ্যুতি ছড়াতে দেখা যায়, আর দেখা যায় অন্ধকারে কিছু কিছু সামুদ্রিক মরা মাছকে ফেলে রাখলে। সাগর বেলায় এক ধরণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকে অন্ধকারে নীল আলোর বিন্দুর মতও দেখা গেছে।

জীবজগতের অনেকের দেহ থেকে আলো নিঃসৃত হলেও একমাত্র জোনাকিদের আলো ছাড়া অপরাপরদের আলো সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। অন্ধকার নামলেই গাছের মগডালে এবং ঝোপে ঝাড়ে দপ দপ করতে থাকে অসংখ্য নীল আলোর ফুলকি। যেন হীরে মাণিক্যের মালা পরে গাছপালা।

এই জোনাকিরা এক ধরণের কীট ছাড়া অন্য কিছু নয়। কীটদের মধ্যে আমরা একমাত্র জোনাকির আলো দেখতে অভ্যস্ত হলেও এই ধরণের বহু কীট আছে পৃথিবীতে; আজ পর্যন্ত হাজারখানেক অনুরূপ কীটের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার যে দ্যুতিসম্পন্ন কীটদের দেখা যায় তারা আরও অদ্ভুত। জোনাকিদের কেবলমাত্র পেটের তলায় নীল আলোর দ্যুতি দেখা যায়, কিন্তু দক্ষিন আমেরিকার সেই সব কীটদের দেহের দুদিকে থাকে দু-সারি নীল আলোর বিন্দু এবং সামনে রেলগাড়ীর হেড লাইটের মত লালআভাযুক্ত আলো। তাই ওদের বলা হয় রেলওয়ে বিট্‌ল।

দ্যুতিসম্পন্ন ঐসব কীটদের বিজ্ঞানীরা বিশেষ এক ফ্যামিলি বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরিবারটির নামকরণ করা হয়েছে ল্যামপিরিডি ফ্যামিলি। যেহেতু ল্যামপিরিডি অর্থে দ্যুতিসম্পন্ন, তাই উক্ত পরিবারে যারাই অন্তর্ভুক্ত তারা সবাই অন্ধকারে দ্যুতি বিতরণ করে। জোনাকিসহ প্রায় হাজার প্রজাতির কীট আছে উক্ত পরিবারে।

এখন প্রশ্ন আসে, ঐ কীটদের দেহ থেকে নীলাভ আলো বিতরণের কারণ কি? কেমন করে খেঁকশিয়ালের মুখ থেকে, জোনাকির পেটের তলদেশ থেকে, কোন কোন সাগর-বাসিন্দার দেহ থেকে নীল আলোর রশ্মি নির্গত হয়?

আলো নির্গত হওয়ার মূলে আছে লুসিফেরিণ নামক নামক এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ। জোনাকিদের দেহে আবার লুসিফেরিণ যেমন থাকে তেমনই থাকে লুসিফেরাস নামে একটি উৎসেচক বা এনজাইম। উৎসেচকটি অবশ্য তাদের দেহে আপনা হতে তৈরি হয়। যখনই লুসিফেরিণ বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখনই বায়ুস্থিত অক্সিজেনের দ্বারা উৎসেচক লুসিফেরাসের উপস্থিতিতে জারিত হয়। আর ঐ জারিত হওয়ার ফলেই নির্গত হয় শক্তি এবং সেই শক্তির

প্রকাশ ঘটে হালকা নীল আলোর মাধ্যমে। লুসিফেরিন আবার ফসফরাসের একটি যৌগ।

দিনের বেলায় জোনাকিদের দেহ থেকেও শক্তি নির্গত হয় কিন্তু সূর্যের তীব্র আলোতে সে শক্তি আদৌ ধরা পড়ে না।

জোনাকির আলোর আর এক বৈশিষ্ট্য, ওতে তাপ নেই। এক কথায় জোনাকিদের দেহ নিঃসৃত আলো একেবারে শীতল আলো। এত শীতল যে, ঐ আলোতে দিনের পর দিন থার্মোমিটারের কুণ্ডকে গুঁজে রাখলেও পারদের সামান্যতম প্রসারণ ঘটবে না। অথচ মানুষ আজ পর্যন্ত যত রকমের আলো উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র ফসফরাসের জারণ ছাড়া কোন আলোই শীতল নয়। সর্বক্ষেত্রে কিছু না কিছু তাপ উৎপন্ন হয়। তাপবিহীন আলো আমরা যেন কল্পনাই করতে পারি না। সেদিক থেকে জোনাকিরা প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

শীতল ও নীল আভাযুক্ত অনুরূপ আলোর যেন একটা যাদু আছে। অনুরূপ আলোতে ঘরকে আলোকিত করতে পারলে কতই না মজা হতো! তাই বলে জোনাকির দেহ থেকে লুসিফেরিণ সংগ্রহ করে ঘরকে আলোকিত করা যাবে না। কারণ, একটিমাত্র ঘরকে আলোকিত করতে গেলে কয়েক লক্ষ জোনাকিকে হত্যা করতে হবে।

আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের কাছে কৃত্রিমভাবে কোন কিছু তৈরি করাটাও এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। তাই কৃত্রিমভাবে লুসিফেরিণ তাঁরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত লুসিফেরিণকে নিয়ে যদি ঘর আলোকিত করতে হয় তাহলে এত খরচ পড়বে যে তিনদিনে রাজাকেও ফকির হতে হবে।

অর্থবান ও সৌখিন কোন ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লুসিফেরিণ সংগ্রহ করে তেমন পরিবেশ যদি আনতে চান তাহলেও তাঁকে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। কারণ, ঐ জাতীয় আলোতে কোন রঙের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে না। সাদা, লাল, হলদে, কালো, সব রঙ মিলেমিশে একাকার দেখাবে। সব কিছু এমনকি মানুষকেও বেখাপ্পা ঠেকবে চোখের সামনে। বিভ্রান্ত হতে হবে, আনন্দের পরিবর্তে বিরক্তিতে ভরে উঠবে মন, সৃষ্টি হবে যেন অপার্থিব অথবা কল্পনার সেই অশরীরীদের পরিবেশ।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, জোনাকির দেহের এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যাতে সে পিঁপড়েদের মত ঝড়-বৃষ্টির খবর পূর্বাহ্নে টের পায়। দেখা গেছে ঝড়ের কয়েকদিন আগে থেকে তারা ভয়ানকভাবে জোট বাঁধে। আলোও যেন আরও

উজ্জ্বল দেখায়। তবে আলোটা নির্গত হয় স্ত্রী-জোনাকিদের পেটের তলা থেকে। পুরুষ-জোনাকিদের দেহ থেকে এমন আলো নির্গত হয় না। বিজ্ঞানীদের মতে স্ত্রী-জোনাকিরা আলোর সঙ্কেতে পুরুষ-জোনাকিদের আমন্ত্রণ জানায়। ওরা অন্ধকারেও ভাল দেখে।

পাখীর পালক

অপরূপা প্রকৃতির এক অনবদ্য সৃষ্টি পাখীরা। এদের সুরেলা গলা, রঙ-বেরঙের পালক, সর্বোপরি ওড়ার ছন্দ চিরকাল মানুষকে মুগ্ধ করে আসছে। কথিত আছে, মানুষ আকাশে ওড়ার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল ঐ পাখীদের কাছ থেকে। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ও যন্ত্রবিদ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি দুহাতে দুটি কৃত্রিম ডানা যুক্ত করে নীল আকাশে গা ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেকে আকাশে উঠতে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টাগুলিকে অবলম্বন করে একদিন আবিষ্কৃত হয়েছিল উড়োজাহাজ।

পণ্ডিতদের মতে পাখীরা নাকি সরীসৃপের বংশধর। পালকবিহীন পাখীর আবির্ভাব হয়েছিল মেসোজোয়িক মহাযুগের শেষ অধ্যায়ে। সেদিন ওদের আকারটা ছিল আজকের ছোটখাট এক একটি উড়োজাহাজের মত কিংবা পুরাণবর্ণিত অতিকায় পাখী গরুড়ের মত। ডানাজোড়ায় পালকের পরিবর্তে চামচিকে বা বাদুড়দের মত পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকতো।

পৃথিবীতে পালকওয়ালা পাখীর আমদানি হয়েছে আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে। পাতলা চামড়ার আবরণের পরিবর্তে ডানায় পালক আসাতেই পাখীরা এত সুন্দর হয়েছে। ঐ পালক এবং পালকের রঙের বাহারই আমাদের সহজে মনকে কেড়ে নেয়।

এখন প্রশ্ন আসে, ঐ পালকটা কি? পাখীদের রঙীন পালক কি কেবলমাত্র তাদের সৌন্দর্য বর্ধন করে?

না, পাখীর পালক সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্ত নয়। ওরা বড্ড রাক্ষুসে। তাই প্রচুর পরিমাণে আহার করতে হয় তাদের। ঐ পেটের জন্য এক জায়গায় অধিক-ক্ষণ বিশ্রাম করারও উপায় নেই। তাই অধিকাংশ সময় তাদের শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু গায়ে রঙ-বেরঙের পালক থাকার জন্য গাছের কাঁচা বা শুকনো পাতা, বাকল, নদীর তীরে বালুকারাশি ইত্যাদির সঙ্গে এমন বেমালুমভাবে মিশে থাকে যে, দূর থেকে টের পায় কার সাধ্য?

বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, গাছে টিয়াপাখী থাকলে আদৌ

ধরা যায় না, ছাতার প্রভৃতি পাখীরা শুকনো পাতার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়, বরফের উপর মেরুদেশের সাদা পেঁচার পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়ে না আদৌ, নদীর চরে সাদা মাটির উপর সাদা বক বসলে হঠাৎ বুঝতে পারা যায় না, এমনই আরও কত কি !

আরও মজার কথা, পাখীদের পালকের রঙ মাঝে মাঝে পরিবর্তিতও হয়। কারও কারও পালকের রঙ শীতকালে সাদা থাকে এবং গ্রীষ্মকালে ধূসর হয়ে যায়।

আসলে রঙ-বেরঙের পালক এবং পালকের রঙ পরিবর্তনের মূলে আছে পাখীদের আত্মরক্ষার উপাদান, খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি। গায়ে একাধিক রঙের পালকও পরিবেশের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে ফেলার একটি প্রধান হাতিয়ার। আর ঐ পালকের জন্যই শত্রুর চোখে যেমন ধূলো দেওয়া যায় তেমনই শিকারকেও সহজে বাগে পাওয়া যায়।

পাখীর গায়ে পালকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। হিসেব করলে দেখা যাবে, ছোট্ট যে চড়ুই পাখী—তারও গায়ে থাকে তিন হাজারের মত পালক। সব পালকের আকার কিন্তু সমান নয়। আকারের দিক থেকে পালকগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—বড়, মাঝারি এবং ছোট। অথচ সব পালকই গজিয়েছে চামড়া থেকে। অপরদিকে পালকে স্নায়ু, রক্ত সঞ্চালনের জন্য শিরা-উপশিরা ইত্যাদি কিচ্ছুটি নেই। সেই কারণে চুল কাটলে আমাদের যেমন ব্যথা হয় না তেমনিই পালক কাটলেও পাখীদের গায়ে ব্যথা লাগে না।

পালকগুলি পাখীর দেহকে যেন বর্মের মত ঘিরে রেখেছে। পালকের উপরিভাগ আবার বেশ তেলতেলেও। পাখীর পালক আবার তাপের অত্যন্ত কুপরিবাহী। তাই পালক বাহিরের আঘাত থেকে যেমন দেহকে রক্ষা করে তেমনই শীত-গ্রীষ্মে কোনও অসুবিধা হয় না। এমন কি প্রচণ্ড শীতেও তাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে।

যে কোন পাখীর দেহে সাধারণত চার শ্রেণীর পালক থাকে। নিম্ন-পালক বা তুলা-পালক, আচ্ছাদক-পালক, সূতা-পালক ও উড্ডয়ন-পালক। নিম্ন-পালকগুলো থাকে একেবারে চামড়ার গায়ে গায়ে। দেখতে অনেকটা তুলার আঁশের মত বলে এদের তুলা-পালকও বলা হয়। সারা শরীরটাকে ঘিরে পুরু ও নরম গদির মত থাকে। পাখীর দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ঐ নিম্ন-পালকই। দেহের তাপটাকে ধরে রাখার জন্য শীতে যেমন ঠাণ্ডা অনুভব করে না তেমনই গরমেও অস্বস্তি অনুভব করে না।

আচ্ছাদক-পালকগুলি আকারে বেশ ছোট। ঐ আচ্ছাদক-পালক এবং

উড্ডয়ন-পালক পাখীকে নির্দিষ্ট আকার দান করেছে এবং এদের দ্বারা পাখী বায়ুপ্রবাহকে কাটিয়ে ঠিকমত চলতে পারে।

সূতা-পালকগুলি দেখতে সরু সরু সূতার মত। এগুলি অত্যন্ত-অনুভূতি সম্পন্ন এবং এদের স্পর্শেই পাখীদের দেহে নানাপ্রকার অনুভূতি জাগে।

উড্ডয়ন-পালকগুলিই আকারে সবচেয়ে বড়। এগুলি থাকে লেজে ও ডানায়। প্রকৃতপক্ষে পালক বলতে আমরা যা বুঝি, তা ঐ আচ্ছাদক-পালক ও উড্ডয়ন-পালক। আকারে বড়-ছোট হলে কি হবে ওদের গঠন প্রায় একই রকমের। দেখতে অনেকটা গাছের পাতার মত। মাঝখানে থাকে শিরা এবং সেই শিরার গোড়ার দিকটা ফাঁপা ও বেশ শক্ত। নিম্নাংশ সরু হয়ে আটকে আছে চামড়ার গায়ে। শিরার দুপাশে দুটি খাড়া ঝালর। ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ঝালরগুলি সরু সরু অসংখ্য সুতো পরপর জোড়া লেগে তৈরি হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় বার্ব। বার্ব থেকে দুদিকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব বর্বিউল বেরিয়েছে এবং ববিউলের গায়ে থাকে অসংখ্য কাঁটা। ফলে একসারির ববিউলের সঙ্গে অপর সারির বর্বিউল জোড়া লেগে যেতে পারে।

যে-কোন একটা পাখীর পালককে নিয়ে পরীক্ষা করলে ববিউলের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। পালকের দুদিকের ঝালরগুলিকে একটু রগড়াতে থাকলে সূতার মত বার্ব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এরপর সেগুলিকে সোজা রেখে একটু চাপ দিয়ে টান দিতে থাকলেই পুনরায় জোড়া লেগে যাবে। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে বিচ্ছিন্ন বার্বগুলির দিকে তাকালে ববিউলগুলিকে দেখাও যায়।

পাখীর ডানার সুসজ্জিত পালক এবং পালকের ঝালরগুলো জোড়া লেগে যায় বলেই ডানা মেললে বাতাস আটকায়। আর এই কারণেই পাখী উড়তে পারে। অনেক সময় বাতাসের ঝাপটায় বা অন্যকোন কারণে বার্বগুলোর জোড়া খুলে যায়। তখন পাখী ঠোঁট দিয়ে অতি অল্প সময়ে পালককে বিন্যস্ত করে ফেলে। তাছাড়া পাখীর লেজের গোড়ার দিকে তৈল গ্রন্থি থাকে। ঠোঁট দিয়ে তারা ঐ তৈলগ্রন্থি থেকে তেল নিয়ে পালক মার্জনা করে। ওতে তাদের পালক উজ্জ্বল থাকে এবং বিন্যস্ত করতেও সুবিধা হয়।

পাখীদের পালক অবশ্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে না। গাছের শুকনো পাতা যেমন ঝরে পড়ে তেমনই পাখীর পালকও দুর্বল হয়ে পড়লে আপনা হতে খসে পড়ে এবং নতুন পালক গজায়। তবে সমূহ পালক একসঙ্গে ঝরে পড়ে না। এমনটি হলে পালক ঝরাকালে পাখীদের আদৌ ওড়ার ক্ষমতা থাকতো না।

পাখীদের ডানার ও লেজের পালক অনেকটা নৌকার দাঁড় ও হালের কাজ করে থাকে। দাঁড় বাইতে থাকলে নৌকা যেমন অগ্রসর হয় তেমনই ডানা-

জোড়ার সাহায্যে পাখা বাতাস কেটে এগিয়ে যেতে পারে। অপরদিকে হাল নৌকাকে বিভিন্ন দিকে বাঁকতে সাহায্য করে। তেমনই পাখীদের লম্বা লম্বা লেজের পালক আকাশে এদিকে ওদিকে অভিমুখ পরিবর্তন করায়।

জীবজন্তুর স্বাভাবিক শক্তি এবং মানুষের তৈরি যন্ত্র

বর্তমান শতাব্দীতে মানুষ এমন কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে যাদের কার্য-প্রণালী দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারি না। যেমন পৃথিবীর আকর্ষণবলকে উপেক্ষা করে উর্ধ্বপানে ছুটে চলেছে রকেট, মুহূর্তমধ্যে দূর-দূরান্তরের কোন বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে দিচ্ছে রাডার, শত্রু বিমানের চলার পথকে অনুসরণ করে ছুটে যাচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র, বুদ্ধিমান মানুষের মত কাজ করে চলেছে কম্পিউটার মেসিন, মানুষের মুখের কথা শোনামাত্রই আপনা হতে টাইপ করে নিচ্ছে বিশেষ ধরণের টাইপমেসিন, মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে নিচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত চালকবিহীন মেসিন ইত্যাদি কত কী!

কিন্তু আমরা কি জানি, এমন কিছু কিছু প্রাণী আছে—যারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপরোক্ত বিস্ময়কর কর্মগুলি সম্পাদন করতে পারে! আর এও কি জানি, মানুষের তৈরি যন্ত্র অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী প্রাণীদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান অনেক বেশী নিখুঁত?

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের তৈরি যন্ত্র জীবজন্তুর স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা অনেক সংবেদনশীল ও কার্যকর। কারণ, প্রাণীদের ইন্দ্রিয়গুলি কয়েক রকমের রাসায়নিক পদার্থ ও জল দিলে গঠিত। তাই অধিক উত্তাপ, বিভিন্ন অম্ল ইত্যাদির পরিবেশে ইন্দ্রিয়দের কাজ করতে অসুবিধা হয় এবং অনুরূপ পরিবেশে বিশেষভাবে নিখুঁত হয় না। মানুষের ভাণ্ডারে উত্তাপ, অম্ল প্রভৃতির নিরোধক বহু সামগ্রী জমা হওয়ায় কিছু কিছু যন্ত্র জীবজন্তুর স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা অধিক কার্যকর।

প্রথমে একালের বিস্ময় জেটবিমান ও রকেটের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। আমরা অনেক সময় আকাশে একটা সরু ধোঁয়ার রেখা ছড়াতে ছড়াতে জেট-বিমানদের আকাশ পরিক্রমা করতে দেখি। জেটরা ওড়ার সময় পরিবেশ থেকে বাতাস গ্রহণ করে এবং সেই বাতাসকে বিশেষ এক ধরণের ইঞ্জিনের সাহায্যে দহন করার ব্যবস্থা করে। দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থ একটা সরু ছিদ্র বা জেটের ভেতর দিয়ে প্রবলবেগে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। আর

তখনই একটা বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিক্রিয়ার বলেই নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী বিমান তীব্র গতিশীল হয়ে উঠে।

এবার রকেটের কথায় আসা যেতে পারে। জেটবিমানের সঙ্গে রকেটের পার্থক্য অনেকখানি হলেও চালিকাশক্তির ক্ষেত্রে দুটি প্রায় অনুরূপ। পরোক্ষ-ভাবে পারিপার্শ্বিক বস্তুকে ব্যবহার করে দুজনেই চালিকাশক্তি অর্জন করে নেয় এবং আত্মনির্ভর হয়ে উঠে।

এমনিতে যে-কোন চলমান বস্তু অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে পারি-পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করে। ফলে লাভ করে চালিকাশক্তি। কিন্তু রকেট বা জেটবিমানের সঙ্গে বাহিরের কোন বস্তুর যোগ থাকে না। এদের অভ্যন্তরের এক অংশের ক্রিয়া অন্য অংশের উপর পতিত হয় এবং সেটি যখন নিষ্কাশিত হয় তখনই বিপরীতমুখী ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ক্রিয়া তাদের অর্জিত।

মানুষ বুদ্ধি বলে রকেট ইঞ্জিন, জেটবিমানের ইঞ্জিন ইত্যাদি তৈরি করেছে। আপাতদৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক বস্তুকে অঙ্গীভূত করে গতিবেগ অর্জন করা কোন জীবের পক্ষে সম্ভব নয় বলে মনে হয়। কিন্তু একরকমের শামুক আছে—যারা চালিকাশক্তি অর্জনের জন্য তাদের পারিপার্শ্বিক বস্তু জলকে গ্রহণ করে। তারপর যখন সেই জলকে সবেগে পরিত্যাগ করতে থাকে তখন বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় অর্জন করে চালিকাশক্তি। তখন কষ্ট করে আর হাঁটতে হয় না।

মানুষের আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি রেডারের কথায় এবার আসা যাক। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে অতি দূরবর্তী কোন বস্তুরও অবস্থান নির্ণয় করা যায়। যেমন শত্রুপক্ষের বিমান, সমুদ্রে কেন্দ্রীভূত ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান ইত্যাদি। রেডারের মূলতত্ত্ব হলো, উক্ত যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত বেতার প্রেরকযন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চ স্পন্দন বিশিষ্ট বেতার তরঙ্গ উৎপাদন করা হয় এবং সেই তরঙ্গকে ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেগুলি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলেও ধরা পড়ে এখানকার গ্রাহক যন্ত্রে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বেতার তরঙ্গের যাওয়া ও আসার সময়টুকুও লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় প্রতিফলকের দূরত্ব। বস্তু যদি গতিশীল হয় তাহলে পর পর প্রতিফলত তরঙ্গকে লাভ করার জন্য বস্তুটির সঠিক গতিবেগও ধরা পড়ে।

ঠিক রেডারের মত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাদুড়েরা। আকাশে যখন তারা উড়তে থাকে তখন তাদের মুখ থেকে নির্গত হয় বেতার তরঙ্গের পরিবর্তে উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ। সেই তরঙ্গ কোন প্রতিফলকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে এলে ধরা পড়ে তাদের কানে এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিবিশিষ্ট স্নায়ুতে। এক্ষেত্রে

বাদুড়ের মুখটা প্রেরক যন্ত্র এবং কান গ্রাহক যন্ত্রের কাজ করে। এবং প্রতিফলকের অবস্থিতিও ঠিক ধরে ফেলে।

মানুষের তৈরি আর একটি আশ্চর্যজনক যন্ত্রের নাম "সোনার"। প্রথমে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ করা হয়। সেই শব্দ সমুদ্রের তলদেশে অথবা তলদেশে লুক্কাইত ডুবো জাহাজ কিংবা ডুবো পাহাড়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং সোনারে ধরা পড়ে।

গভীর সমুদ্রের মাছ এবং ডলফিনরাও ঠিক একই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারাও শব্দ প্রেরণ করতে পারে এবং প্রতিফলিত শব্দ লাভ করে শিকারের অবস্থিতি জেনে নেয়। শব্দতরঙ্গ এবং তার প্রতিধ্বনির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগা-যোগও স্থাপন করতে পারে তারা।

শোনা যায়, কেউটে প্রভৃতি সাপকে কেউ আঘাত করলে আঘাতকারীকে সাপ নিঃশব্দে এবং সবার অলক্ষ্যে অনুসরণ করে। ব্যাপারটা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে মরুভূমির র‍্যাটেল সাপদের ঐ বৈশিষ্ট্য আছে। ওদের দুচোখের মাঝখানে বিশেষ ধরণের স্নায়ু থাকে। ঐ স্নায়ুর সাহায্যে বাতাসের অতি সামান্যতম তাপ-মাত্রার পরিবর্তনও ধরতে পারে। ঐ কারণে ওদের পাশ দিয়ে অতি দ্রুত গতিতেও কোন শিকার যদি ছুটে পালায় তাহলে অক্লেশে চোখ বন্ধ করেও অনুসরণ করতে পারে এবং শিকারকে ঠিক ধরে নেয়।

র‍্যাটেল সাপদের ঐ স্নায়ুর সঙ্গে মানুষের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রের তুলনা করা যেতে পারে। ক্ষেপণাস্ত্র চালকবিহীন। অথচ এরা তাপমাত্রার তারতম্যকে কাজে লাগিয়ে শত্রুবিমানকে অনুসরণ করে থাকে। তবে র‍্যাটেল সাপদের মত উচ্চতার এমন সামান্য পরিবর্তন ধরতে পারে না।

সবশেষে মানুষের নিজেদের কথায় আসা যেতে পারে। আমরা জানি, মানুষের মস্তিষ্কই মানুষকে সমস্ত জীবজন্তু থেকে পৃথক করেছে, তাকে মহান করেছে এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে চিহ্নিত করেছে। আমাদের সমূহ বিস্ময়কর কর্মের মূলেই মস্তিষ্ক।

মানুষের তৈরি বৈদ্যুতিক কম্পিউটার যন্ত্র কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের চেয়েও উন্নত এবং দ্রুত কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে। অপরদিকে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির অনেকক্ষেত্রে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, দেহত্বকের সাহায্যে তাপমাত্রার অল্পস্বল্প পরিবর্তন ধরা যায় না, কোন দৃশ্যপট হঠাৎ চোখের সামনে উপস্থাপিত করলে মস্তিষ্কে অনুভূতি জাগতে ১/১০ সেকেণ্ড সময় লাগে। কোনকিছু করতে গেলে দেহের আড়ষ্টতা কাটাতেও অনুরূপ সময়ের দরকার হয়। কিন্তু মানুষের তৈরি যন্ত্র এমন ভুল করে না।

পৃথিবীর জীবজগৎ সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে এমনই আরও কত বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। দেখেছেন, পায়রাদের এবং যাযাবর পাখীর এমন অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যে, তারা ঠিক ঠিক পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এমনকি চোখ বাঁধা অবস্থায়ও। কেবলমাত্র ঘ্রাণশক্তির দ্বারা কুকুর দুর্বৃত্তদের চিনে নিতে পারে, জলের তলায় বিশাল বিশাল তিমিরা অতি অল্পশক্তি নিয়োগ করেও জলের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অতিক্রম করে এবং যথেচ্ছভাবে চলাফেরা করতে পারে, অতি ক্ষুদ্র যে পিঁপড়ে সেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা আগেভাগে টের পায়, ইত্যাদি।

জীবদের এই স্বাভাবিক শক্তিগুলি আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ওদের দৈহিক কার্যাবলী ব্যাখ্যাও করতে পারেনি মানুষ। তবে ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানীদের চেষ্টার অন্ত নেই। তাঁদের ধারণা, জীব-জন্তুদের স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলির রহস্য যদি সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত করতে পারেন তাহলে তাঁদের তৈরি যন্ত্র একদিকে যেমন আরও উন্নত হবে অপরদিকে তেমনই নতুন নতুন বিস্ময়কর যন্ত্রও প্রস্তুত করতে পারবেন। উক্ত গবেষণা বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে বায়োনিক্স।

বায়োনিক্স শাখায় উদ্ভিদেরও অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাগুলি গবেষণার অন্যতম বিষয়। সূর্যমুখী সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, দিনের বেলায় শালুক ফুলরা পাপড়ি বন্ধ করে ফেলে, শিরীষ প্রভৃতি গাছের পাতা মেঘলা দিনেও সূর্যাস্তের প্রাক্কালে পাতাগুলো কুঁকড়ে যায়, ঝিঙে ফুল বিকেলের দিকে ফোটে, ইত্যাদি কারণগুলি এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। এগুলি সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন এবং বায়োনিক্স শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।